

হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প

পরশুরাম

হনুমানের স্বপ্ন

ইত্যাদি গল্প

হনুমানের স্বপ্ন

ইত্যাদি গল্প

পরশুরাম

শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স, লিঃ
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
১৪, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

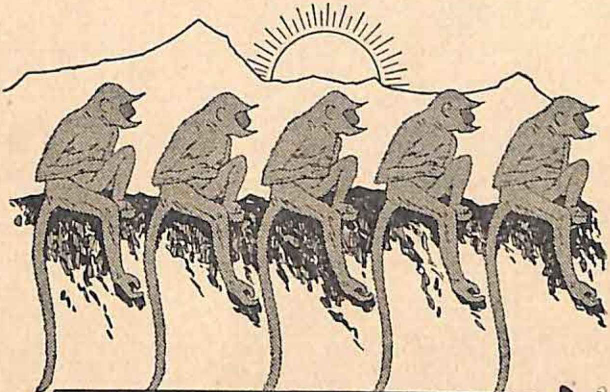
দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৪৬

মূল্য দেড় টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

গল্প

চিত্র



হনুমানের স্বপ্ন

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কোশলরাজ্য শান্তির ও স্বাস্থ্যের নিলয় হইল, প্রজার গৃহ ধনধান্যে ভরিয়া উঠিল, তস্কর, বঞ্চক ও পণ্ডিত-মূর্খগণ বৃত্তিনাশহেতু পলায়ন করিল। দেশে আর্ত পীড়িত নাই, ধর্মাধিকরণে বাদী প্রতিবাদী নাই, কারাগার জনশূন্য।

ভিষগ্‌গণ রোগীর অভাবে ভোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন. বিচারকগণ পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধানে রত হইয়া অবসরবিনোদন করিতে লাগিলেন।

হনুমান্‌ এখন অযোধ্যাতেই বাস করেন। রাম তাঁহার জন্য এক সুরম্য কদলীকাননে সপ্ততল কাষ্ঠভবন নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মহাবীর তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং ভক্ত প্রজাবর্গের সমাদরে সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি লাভ করিলেন।

কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁহার ভাবান্তর লক্ষিত হইল। অযোধ্যাবাসী উদ্বিগ্ন হইয়া দেখিল পবননন্দন দিন দিন কৃশ হইতেছেন, তাঁহার কান্তি ম্লান হইতেছে, তাঁহার আর তেমন স্ফূর্তি নাই। রামের আদেশে রাজবৈদ্যগণ হনুমানের চিকিৎসা করিলেন, বিস্তর অরিষ্ট মোদক রসায়নাদির ব্যবস্থা হইল, কিন্তু কোনও উপকার দর্শিল না। ভিষগ্‌গণ হতাশ হইয়া বলিলেন, মহাবীরের যে ব্যাধি তাহা আধ্যাত্মিক, ঔষধে সারিবার নয়। অগত্যা বশিষ্ঠ ঋষি হনুমানের মঙ্গলকামনায় এক বিরাট্‌ যজ্ঞের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রাজ্ঞী সীতা হনুমান্‌কে রাজান্তঃপুরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস, তোমার কি হইয়াছে প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমার মাতৃতুল্য, বলিতে সংকোচ করিও না।'

মহাবীর কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বাম গ্রীবা কণ্ডূয়ন করিলেন, তাহার পর দক্ষিণ গ্রীবা কণ্ডূয়ন করিলেন। তদনন্তর মস্তক

নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—'মাতঃ, আমার গোপন কথা যদি নিতান্তই শুনিতে চাও তবে না বলিয়া উপায় নাই। কিছুদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে পিতৃগণকে দেখিয়াছি। তাঁহারা সুমেরু শিখরে সারি সারি পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন এবং বিষণ্ণ বদনে নিজ নিজ উদরে হাত বুলাইতেছেন। এই দুঃস্বপ্নের অর্থ আমি বশিষ্ঠপুত্র বামদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, হে মহাবীর, ও কিছু নয়, তোমার পিতৃগণ ক্ষুধিত হইয়াছেন, তুমি কদলী দগ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধ কর এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূরিদক্ষিণা দাও। আমি বামদেবের উপদেশ পালন করিলাম, কিন্তু তাহার পর আবার পিতৃগণ আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। তখন আমার জ্ঞান হইল যে তাঁহারা ক্ষণিক ব্যবস্থায় তৃপ্ত হইবেন না। আমার মৃত্যুর পর কে তাঁহাদিগকে পিণ্ড দিবে? লোকে যে-বয়সে বিবাহ করিয়া গার্হস্থধর্ম পালন করে, আমি সেই বয়সে সুগ্রীবের অনুচর হইয়া বানপ্রস্থে কালহরণ করিয়াছি। এখন প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় সুগ্রীব রাজ্যলাভ করিয়াছেন, রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে, আমারও অবসর মিলিয়াছে। কিন্তু আমি এখন বার্ধক্যের দ্বারদেশে উপস্থিত, এখন যদি দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইতে চাই তবে লোকে আমাকে ধিক্কার দিবে। হা, আমার পিতৃঋণ শোধের কি উপায় হইবে? হে দেবি, এই দুশ্চিন্তা আমাদের অহরহ দহন করিতেছে, আমি নিরন্তর পিতৃগণের করিব এবং ও শূন্য উদর দেখিতে পাইতেছি, অ আহার করিব।'

শান্তি নাই।' এই বলিয়া হনুমান্ নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

হনুমানের বচন শুনিয়া দেবী জানকী ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন—'হে বীরশ্রেষ্ঠ, এজন্য আর চিন্তা কি? তুমি লোকলজ্জায় অভিভূত হইও না, এই দণ্ডে বিবাহ করিয়া পিতৃগণকে নিশ্চিন্ত কর। তোমার কী এমন বয়স হইয়াছে? আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় তোমার অপেক্ষাও অধিক বয়সে ভরতজননীকে গৃহে আনিয়াছিলেন। আমি আমার সখীগণকে ডাকিয়া আনিতেছি, তাহারা সকলেই সুরূপা সুশীলা সদ্‌বংশীয়া। তোমার যাহাকে ইচ্ছা পত্নীত্বে বরণ কর। হে কপিপ্রবর, আমি নিশ্চয় কহিতেছি এই অযোধ্যায় এমন কন্যা নাই যে তোমাকে পতিরূপে পাইয়া ধন্য হইবে না। তুমি তোমার জাতির জন্য কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না। আমি অনুরোধ করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ উপনয়নসংস্কার দ্বারা তোমাকে ক্ষত্রিয় বানাইয়া দিবেন। অথবা যদি মানবীতে তোমার অভিরুচি না থাকে তবে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর এবং একটি পরমা সুন্দরী বানরীর পাণিগ্রহণ করিয়া সত্বর অযোধ্যায় ফিরিয়া আইস। তোমার পত্নীর নাম যাহাই হউক আমি তাহাকে হনুমতী বলিব এবং এই রাজপুরীর বধূগণমধ্যে [illegible] গ্রহণ করিব।'

মহাব[illegible]মান্ প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন—'জনকনন্দিনি, তাহার পর দক্ষিণ গ্রাব[illegible]কৌলীন্য ভঙ্গ করিব না, বানরীই

বিবাহ করিব এবং শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া অদ্যই কিষ্কিন্ধ্যা যাত্রা করিব।'

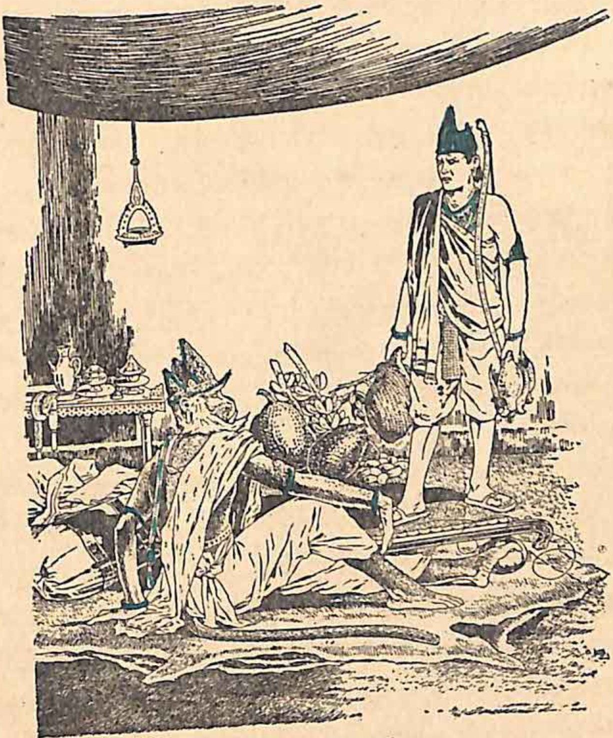
হনুমান্ নানা গিরি নদী বনভূমি অতিক্রম করিয়া দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন অপরাহ্ণ, সূর্যাস্তের বিলম্ব নাই। মহাবীর এক বিশাল শাল্মলিতরুর শাখায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন নিকটে কোথাও রাত্রিবাসের উপযুক্ত আশ্রয় আছে কিনা। সহসা অদূরে একটি সুবৃহৎ পর্ণগৃহ নয়নগোচর হইল। হনুমান্ বৃক্ষ হইতে নামিয়া সেই গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাহার অভ্যন্তর পরিপাটিরূপে সজ্জিত। ভূমিতে কোমল তৃণরাশির উপর মসৃণ মৃগচর্মের আস্তরণ, এক কোণে স্তূপীকৃত সুপক্ব আম্র-পনস-রম্ভাদি ফল, অন্য কোণে চন্দনকাষ্ঠের মঞ্চের উপর রাজোচিত বসন উত্তরীয় উষ্ণীষ প্রভৃতি পরিচ্ছদ এবং বিবিধ প্রসাধনদ্রব্য, প্রাচীরগাত্রে লম্বিত একটি সুরম্য পরিবাদিনী বীণা।

হনুমান্ সমস্ত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন—'অহো, নিশ্চয়ই স্বর্গস্থ পিতৃগণ আমার প্রতি স্নেহবশে এই উপহারসামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত আমি এখনই এই পরিচ্ছদ ধারণ করিব এবং রাত্রিকালে এই উপাদেয় ভোজ্যসকল আহার করিব।'

এই বলিয়া হনুমান্ সেই বিচিত্র বসন-উত্তরীয়াদি পরিধান করিলেন এবং মস্তকে উষ্ণীষ স্থাপন করিয়া অতিশয় শোভমান হইলেন। তাহার পর শয্যায় উপবেশন করিয়া ভাবিলেন—'এখনও বেলা অবসান হয় নাই, ভোজনের বিলম্ব আছে, ততক্ষণ আমি এই বীণা বাজাইয়া দেখি।'

মহাবীর সাবধানে বীণাটি পাড়িলেন, কিন্তু বাদ্যের উপক্রম করিতেই তাঁহার প্রবল অঙ্গুলিস্পর্শে সমস্ত তার ছিঁড়িয়া গেল। হনুমান্ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'এই ক্ষণভঙ্গুর যন্ত্র মাদৃশ বীরের অস্পৃশ্য।' তখন তিনি মৃগচর্মে শয়ান হইয়া ভাবী ভার্যার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কান্তা কেমন হইবে? তন্বী না স্থূলা, পিঙ্গলবর্ণা না রক্তকপিশপ্রভা, ধীরা না চপলা, কলকণ্ঠী না কর্কশনাদিনী? ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল। হনুমান্ স্বগত কহিতে লাগিলেন—'অহোবত, আমি এ কী ঘোর কর্মে ব্যবসিত হইয়াছি! আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছি, লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছি, গন্ধমাদন উৎপাটিত করিয়াছি। সাগরে অম্বরে পর্বতে অরণ্যে আমার অজ্ঞাত কিছু নাই। আমি সমরে অভিজ্ঞ, সংকটে ধীর, দেবচরিত্র কাকচরিত্র আমার নখদর্পণে। কিন্তু স্ত্রীজাতির রহস্য আমি কি-ই বা জানি! এই অদ্ভুত প্রাণীর গুম্ফ নাই শ্মশ্রু নাই বল নাই বুদ্ধি নাই। অথচ দেখ ইহারা শিশুকে স্তন্যদান



'ওরে বানরাধম'

করে কিন্তু আমরা তাহা পারি না। ইহারা অকারণে হাস্য করে, অকারণে ক্রন্দন করে, তুচ্ছ মুক্তা প্রবাল ইহাদের প্রিয়, সন্তানপালন ও নিরর্থক বস্তুসংগ্রহই

একমাত্র কার্য। ঈদৃশী কোমলাঙ্গী মসৃণবদনী পয়স্বিনী শিশুপালিনী ভার্যার সহিত আমি কিরূপ ব্যবহার করিব? যদি সে আমার প্রিয়কার্য করে তবে কি মস্তকে উত্তোলন করিয়া সমাদর করিব? যদি অবাধ্য হয় তবে কি চপেটাঘাতে বিনীত করিব? বানরধর্মশাস্ত্রে এবংবিধ শাসনের বিধান আছে বটে, কিন্তু মানবশাস্ত্র কি বলে?'

হনুমান্ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সেই পর্ণগৃহের দ্বারদেশে এক সুদর্শন যুবাপুরুষের আবির্ভাব হইল। তাঁহার বেশভূষা বহুমূল্য, স্কন্ধ হইতে শরাসন লম্বিত, পৃষ্ঠে তূণীর, এক হস্তে বাণবিদ্ধ দশটি তিত্তির পক্ষী, অন্য হস্তে একটি সদ্য আহৃত বৃহৎ মধুচক্র।

আগন্তুক হনুমান্‌কে দেখিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন—'ওরে বানরাধম, তুই কোন্ সাহসে আমার রাজবেশ আত্মসাৎ করিয়া আমার শয্যায় শুইয়া আছিস? দাঁড়া, এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাইতেছি।'

হনুমান্ কহিলেন—'ওহে বীরপুংগব, তিষ্ঠ তিষ্ঠ। হঠকারিতা মূর্খের লক্ষণ, ধীর ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য করেন। আমি রামদাস হনুমান্, লোকে আমাকে মহাবীর বলে। ইহার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।'

তখন আগন্তুক সসম্ভ্রমে ললাটে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া কহিলেন—'অহো, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে শ্রীহনুমানের

দর্শন লাভ করিলাম! মহাবীর, তুমি অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তুম্বদেশের অধিপতি, নাম চঞ্চরীক। তোমার যোগ্য সৎকার করি এমন আয়োজন আমার এই অরণ্যকুটীরে নাই। যদি কোনও দিন আমার রাজপুরীতে পদরেণু দাও তবেই আমার তৃপ্তি হইবে। হে অঞ্জনানন্দন, তুমি ঐ রমণীয় পরিচ্ছদ উষ্ণীষাদি খুলিয়া ফেলিতেছ কেন, উহাতে তোমাকে সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় দেখাইতেছে। আমি এই রজতময় দর্পণ ধরিতেছি একবার অবলোকন কর। তুমি অনুমতি দাও, আমি এই সুস্বাদু তিত্তিরমাংস অগ্নিপক্ক করিয়া দিতেছি। তুমি বুঝি নিরামিষাশী? তবে ঐ আম্র-পনস-রম্ভাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি কর। হে মারুতি, তুমি বিমুখ হইও না, একবার মুখব্যাদান কর, আমি এই মধুচক্র তোমার বদনে নিংড়াইয়া দিই। তুমি বোধ হয় সংগীতচর্চা করিতেছিলে, তাই আমার বীণাটির এমন দশা হইয়াছে। হে মহাবীর, তুমি বুঝি কার্মুক ভাবিয়া উহাতে টংকার দিয়াছিলে?'

হনুমান্ কহিলেন—'চঞ্চরীক, তোমার অভ্যর্থনায় আমি প্রীত হইয়াছি। কিন্তু তুমি অধিক বাচালতা করিও না, আমার এই বজ্রমুষ্টি দেখিয়া রাখ, ইহা হঠাৎ ধাবিত হয়। এই পরিচ্ছদে আমি অস্বস্তি বোধ করিতেছি, তুমিই ইহা পরিধান করিও। আমার আহারের জন্য ব্যস্ত হইও না, যথাকালে তাহা হইবে। তোমার বীণা

কোনও কর্মের নয়। দুঃখ করিও না, আমি উহাতে শণের রজ্জু লাগাইয়া দিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কিজন্য বিজন অরণ্যে এই কুটীর নির্মাণ করিয়াছ? যদি নরপতি হও, তবে তোমার গজ বাজী অনুযাত্র সৈন্যদল দেখিতেছি না কেন? তোমার রথ সারথি কোথায়, বিদূষকই বা কোথায়?'

চণ্ডরীক কহিলেন—'হে বানরর্ষভ, আমি মনের দুঃখে একাকী অরণ্যবাস করিতেছি, এখন আমিই আমার রক্ষী, আমিই সারথি, আমিই বিদূষক। আমার কাহিনী অতি করুণ, শ্রবণ কর। আমার মহিষী পরমরূপবতী এবং অশেষগুণশালিনী, কিন্তু তাঁহাকে ঠিক পতিব্রতা বলিতে পারি না। একদা আমি তাঁহার এক সুন্দরী সখীর সহিত কিঞ্চিৎ রসচর্চা করিতেছিলাম, দুরদৃষ্টক্রমে তিনি তাহা দেখিয়া ফেলেন। এই তুচ্ছ কারণে তিনি বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ক্রোধাগারে বসতি করিয়াছেন। আমিও তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে এই অরণ্যে বাস করিতেছি এবং পশুপক্ষী মারিয়া বিরহযন্ত্রণা লাঘব করিতেছি। হে পবননন্দন, এখন আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে একা ভার্যা অশেষ অনর্থের মূল। শাস্ত্র যথার্থই বলিয়াছেন—অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ। শুনিয়াছি এই অরণ্যে মহাতপা লোমশ মুনি বাস করেন। নারীজাতিকে বশে রাখিবার উপায় তিনি সম্যক্ অবগত আছেন, কারণ তাঁহার একশত পত্নী। আমি স্থির করিয়াছি তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিব। আমার কথা সমস্ত বলিলাম,

এখন তুমি কি জন্য অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ শুনিতে ইচ্ছা করি। রামচন্দ্র কি পূর্বোপকার বিস্মৃত হইয়া তোমার অনাদর করিয়াছেন?'

হনুমান্ কহিলেন—'সাবধান, তুমি রামনিন্দা করিও না। আমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতেছি, সেখানে দারপরিগ্রহ করিয়া বধূর সহিত অযোধ্যায় ফিরিব। তোমার উপর আমার প্রীতি জন্মিয়াছে, অতএব মনের কথা খুলিয়া বলি। হে চঞ্চরীক, আমি স্ত্রীতত্ত্ব অবগত নহি, কেবল পিতৃ-ঋণ পরিশোধের নিমিত্তই এই দুরূহ সংকল্প করিয়াছি। তোমার দাম্পত্যকাহিনী শুনিয়া আমার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে।'

চঞ্চরীক হাস্য করিয়া কহিলেন—'হে হনুমন্, ভয় নাই। তুমি যখন গন্ধমাদন বহন করিয়াছ তখন ভার্যার ভারও বহিতে পারিবে। আমি তোমাকে সমস্তই শিখাইয়া দিব। সম্প্রতি কিছু সারগর্ভ উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর। পুত্রার্থে ভার্যা করা অতি সহজ কর্ম, কিন্তু যদি প্রেমের জন্য ভার্যা করিতে হয় তবে স্ত্রীচরিত্রে অভিজ্ঞতা আবশ্যক। নিজস্ত্রী সলজ্জা হইবে এবং পরস্ত্রী নির্লজ্জা হইবে ইহাই রসজ্ঞজনের কাম্য। তোমার রামরাজ্যের কথা অবগত নহি, কিন্তু সংসারে এই শুভসমন্বয় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অতএব—'

হনুমান্ কহিলেন—'ওহে চঞ্চরীক, তুমি ক্ষান্ত হও। অগ্রে নিজ সমস্যার সমাধান কর তাহার পর আমাকে উপদেশ দিও। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন ভোজনের

আয়োজন করিতে পার। কুটীরদ্বার বন্ধ করিয়া দাও, বনভূমির শীতবায়ু আর আমার তেমন সহ্য হয় না।'

চঞ্চরীক অর্গল বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন এবং ভোজনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সহসা দ্বারে করাঘাত করিয়া কে বলিল—'ভো গৃহস্থ, অর্গল মোচন কর, আমি শীতার্ত ক্ষুধার্ত অতিথি।'

চঞ্চরীক দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে এক শীর্ণকায় তপস্বী গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তক জটামণ্ডিত, শ্মশ্রু আজানুলম্বিত, দেহ লোমে সমাকীর্ণ।

চঞ্চরীক প্রণাম করিয়া কহিলেন—'তপোধন, আপনাকে দেখিয়াই চিনিয়াছি যে আপনি স্বনামধন্য লোমশ ঋষি। আপনার দর্শনলাভের জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছিলাম, আপনি বোধ হয় যোগবলে জানিতে পারিয়া কৃপাবশে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তুম্বরাজ চঞ্চরীক, আর ইনি আমার পরমবন্ধু জগদ্‌বিখ্যাত মহাবীর হনুমান্‌। এই কপিপ্রবর দারপরিগ্রহের নিমিত্ত কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতেছেন, কিন্তু সহসা ইঁহার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে। আমার অবস্থাও ভাল নয়। আমার একটি ভার্যা আছেন বটে, কিন্তু আমি বৈচিত্র্যের পিপাসু, ভূমার আস্বাদ লইতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, শুনিয়াছি দাম্পত্যতত্ত্বে আপনার

জ্ঞানের পরিসীমা নাই। আপনার জন্য এই পক্ষিমাংস শূল্যপক্ক করিয়া দিতেছি, আপনি ততক্ষণ কিঞ্চিৎ সৎপরামর্শ দিন।'

ইত্যবসরে মহর্ষি লোমশ একটি অতিকায় পনস ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার সুপক্ক কোষসকল ক্ষিপ্রহস্তে বদনে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এখন ভোজন সমাপ্ত করিয়া কহিলেন—'পবননন্দন চিরজীবী হও, তুম্বরাজ তোমার জয় হউক। এখন আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিতেছি। অষ্টাহকাল আমার আহার নিদ্রা নাই, আমি গৃহচ্যুত কৌপিনমাত্রসম্বল।'

শরাসনে ঝটিতি জ্যারোপণ করিয়া চঞ্চরীক কহিলেন—'প্রভো, কোন্ দুরাচার রাক্ষস আপনার আশ্রম লুণ্ঠন করিয়াছে? অনুমতি দিন, এই দণ্ডে তাহাকে বধ করিব। আহা, আপনার সকল পত্নীই কি অপহৃতা হইয়াছেন? মহাবীর, অবাক্ হইয়া ভাবিতেছ কি? গাত্রোত্থান কর, আবার তোমাকে সাগরলঙ্ঘন করিতে হইবে। বিভীষণকে ছাড়িয়া দিয়া ভাল কর নাই।'

লোমশ কহিলেন—'তোমরা ব্যস্ত হইও না, আমার ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্বে এই দক্ষিণাপথে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার প্রতিকারকল্পে শতজন নরপতি আমার শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের রাজ্যের হিতার্থে আমি এক বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারা সুবৃষ্টি আনয়ন করি। কৃতজ্ঞ

নরপতিগণ দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাদের শতকন্যা আমাকে সম্প্রদান করেন এবং ভরণপোষণের যথোচিত ব্যবস্থাও করেন। আমি এই রাজনন্দিনীগণের বাসের নিমিত্ত আমার তপোবনে একশত গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছি।'

চঞ্চরীক জিজ্ঞাসিলেন—'মুনিবর, আপনার তপোবনে ক্রোধাগার আছে তো?'

লোমশ কহিলেন—'প্রত্যেক গৃহই ক্রোধাগার। হত-ভাগিনীগণ নিরন্তর কলহ করে, তাহাদের গৃহকর্ম নাই, পতিসেবা নাই, ব্রতপূজা নাই। আমি আদর করিয়া তাহাদের প্রথমা দ্বিতীয়া ইত্যাদিক্রমে নবনবতিতমী শততমী পর্যন্ত নাম রাখিয়াছি, কিন্তু তাহারা পরস্পরকে মূষিকা চর্মচটিকা পেচকী ছুছুন্দরী প্রভৃতি ইতর নামে সম্বোধন করে এবং আমাকে ভল্লুক বলে। আমি উত্ত্যক্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছি, এখন সেই ব্যাপিকাগণ যত ইচ্ছা কলহ করুক। হে রাজন্, তুমি কি ভূমার আস্বাদ চাও? তবে আমার আশ্রমে যাও। শ্রীহনুমান্‌ও তথায় পত্নীনির্বাচন করিতে পারিবেন। আমি আর সেখানে ফিরিতেছি না। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আমি শান্তি চাই এবং আর একটি বিবাহ করিয়া এক পত্নীর যে সুখ তাহাই উপলব্ধি করিতে চাই।'

লোমশ মুনির বচন শুনিয়া হনুমান্ কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিলেন। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন—'হে তপোধন, প্রণিপাত করি, হে চঞ্চরীক, তোমার মনস্কামনা

পূর্ণ হউক। এখন বিদায় দাও, আমি সুগ্রীবের নিকট চলিলাম।'

চঞ্চরীক ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—'সে কি! এই গভীর রজনীতে অরণ্যপথে কোথায় যাইবে? অন্তত প্রভাত পর্যন্ত এখানে বিশ্রাম কর।'

হনুমান্ কর্ণপাত করিলেন না।

কিষ্কিন্ধ্যার এক সুরম্য উপবনে নল নীল গয় গবাক্ষ প্রভৃতি মিত্রগণের সহিত বসিয়া বানররাজ সুগ্রীব নারিকেল ভক্ষণ করিতেছিলেন এমন সময় হনুমান্ আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

সুগ্রীব রাজোচিত গাম্ভীর্য সহকারে কহিলেন—'মহাবীর, কি মনে করিয়া? আমি এখন রাজকার্যে ব্যস্ত আছি, অবসর নাই, অন্য কালে তোমার বক্তব্য শুনিব।'

হনুমান্ কহিলেন—'হে বানরাধিপ, আমি এক বিশেষ প্রয়োজনে তোমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি।'

সুগ্রীব কহিলেন—'কিষ্কিন্ধ্যায় তোমার সুবিধা হইবে না। তোমার অরণ্যসম্পত্তি যাহা ছিল সমস্তই অঙ্গদ-বাবাজী দখল করিয়াছেন, ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। আমারও এখন অত্যন্ত অভাব চলিতেছে, তোমাকে কিছু দিতে পারিব না। অযোধ্যা ছাড়িলে কেন? ফিরিয়া গিয়া তোমার প্রভু রামচন্দ্রকে

নিজ প্রার্থনা জানাও, তিনি অবশ্যই একটা বিহিত করিবেন। রাঘব তো মন্দ লোক নহেন।'

হনুমান্ কহিলেন—'ওহে সুগ্রীব, তোমার চিন্তা নাই। আমি পূর্বসম্পত্তি চাহি না, তোমার রাজ্যের ভাগও চাহি না, প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় আমার কোনও অভাব নাই। আমি বিবাহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। কিন্তু এই অনভ্যস্ত ব্যাপারে আমি সংশয়াম্বিত হইয়াছি, তুমি সৎপরামর্শ দাও।'

সুগ্রীব তখন প্রীত হইয়া কহিলেন—'হে সুহৃদ্‌বর, তোমার সংকল্প অতিশয় সাধু। এতক্ষণ বাজে কথা বলিতেছিলে কেন? ঐ সুকোমল বৃক্ষশাখায় উপবেশন কর, কিঞ্চিৎ নারিকেলোদক পান করিয়া স্নিগ্ধ হও। হে ভ্রাতঃ, আমি সর্বদাই তোমার হিত-কামনা করিয়া থাকি। কেবলই ভাবি, আহা, আমাদের হনুমান্ এখনও সংসারী হইল না! তুমি বিবাহের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিও না, উহা অতি সহজ কর্ম। দেখ, আমি অষ্টোত্তর-সহস্র ভার্যায় পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেছি।'

হনুমান্ কহিলেন—'তুমি এই পত্নীপুঞ্জ শাসনে রাখ কি করিয়া? তাহারা কলহ করে না? তোমাকে বাক্যবাণে প্রপীড়িত করে না?'

সুগ্রীব সহাস্যে কহিলেন—'সাধ্য কি। আমি কদলী-বল্কল দ্বারা তাহাদের ওষ্ঠাধর বাঁধিয়া রাখি, কেবল প্রেমালাপ-কালে খুলিয়া দিই। যাহা হউক, তোমার ভয় নাই। আপাতত তুমি একটিমাত্র পত্নী গ্রহণ কর, পরে ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি

করিও। আমি বলি কি—তুমি অন্যত্র চেষ্টা না করিয়া শ্রীমতী তারাকে বিবাহ কর, আমার আর তাঁহাকে প্রয়োজন নাই। তিনি প্রবীণা এবং পতিসেবায় পরিপক্কা। তাঁহাকে লাভ করিয়া তুমি নিশ্চয় সুখী হইবে।'

হনুমান্ কহিলেন—'তুমি তারাদেবীর নাম করিও না, তিনি আমার নমস্যা।'

সুগ্রীব কহিলেন—'বটে! অযোধ্যায় থাকিয়া তোমার মতি-গতি বিগড়াইয়াছে দেখিতেছি। আচ্ছা, তুমি আর এক চেষ্টা করিতে পার। এই কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণে কিচ্চট দেশ আছে। তাহার অধিপতি প্লবংগম অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর গমন করিয়াছেন, এখন তাঁহার দুহিতা চিলিম্পা রাজ্যশাসন করিতেছে। এই বানরী অতিশয় লাবণ্যবতী বিদুষী ও চতুরা। আমি বিবাহের প্রস্তাবসহ দূত পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু লাঙ্গুল কর্তন করিয়া চিলিম্পা তাহাকে বিদায় দিয়াছে। নল নীল গয় গবাক্ষ ইঁহারাও প্রেমনিবেদন করিতে তাহার কাছে একে একে গিয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই ছিন্নলাঙ্গুল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুর্বিনীতা বানরীর উপর আমার লোভ ও আক্রোশ উভয়ই আছে, কিন্তু আমার অবসর নাই, নতুবা স্বয়ং অভিযান করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতাম। এখন তুমি যদি তাহাকে জয় কর তবে আমার ক্ষোভ দূর হইবে, তোমারও পত্নীলাভ হইবে।'

হনুমান্ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—'তাহাই হউক। আমি এখনই কিষ্কিন্ধ্য দেশে যাত্রা করিতেছি।'

হনুমান্ কিচ্চটরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশাল বপু দেখিয়া প্রজাগণ সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল এবং চিলিম্পাকে সংবাদ দিল—'হে রাজনন্দিনি, আর রক্ষা নাই, এক পর্ব্বতাকার বীর বানর তোমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে।'

চিলিম্পা কহিলেন—'ভয় নাই, অমন অনেক বীর দেখিয়াছি। তাহাকে ডাকিয়া আন।'

হনুমান্ এক মনোরম কুঞ্জবনে আনীত হইলেন। চিলিম্পা তথায় সখীগণে পরিবৃতা হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার কর্ণে রক্তপ্রবাল, কণ্ঠে কপর্দমালা, হস্তে লীলাকদলী। হনুমান্ মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—'অহো, সুগ্রীব যথার্থই বলিয়াছেন। এই তরুণী বানরী পরমা সুন্দরী, ইহাকে দেখিবামাত্র আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, সংশয় দূর হইল। ইহাকে যদি লাভ করিতে না পারি তবে জীবনই বৃথা।'

ঈষৎ হাস্যে কুন্দদন্ত বিকশিত করিয়া চিলিম্পা কহিলেন—'হে বীরবর, তুমি কি-হেতু বিনা অনুমতিতে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ? তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কি চাও, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমাকে অভয় দিলাম।'

হনুমান্ উত্তর দিলেন—'হে প্লবংগম-নন্দিনী, আমি রামদাস হনুমান্, অযোধ্যা হইতে আসিয়াছি, তোমার পাণি-গ্রহণ করিয়া আবার অযোধ্যায় ফিরিতে চাই। আমিও তোমাকে অভয় দিতেছি।'

হনুমানের বাক্য শুনিয়া সখীগণ কিলকিলা রবে হাসিয়া উঠিল। চিলিম্পা কহিলেন—'হনুমন্, তোমার ধৃষ্টতা তো কম নয়! তোমার কি এমন গুণ আছে যাহার জন্য আমার পাণিপ্রার্থী হইতে সাহসী হইয়াছ?'

হনুমান্ কহিলেন—'আমি সেই রামচন্দ্রের সেবক যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যান, যিনি রাবণকে সবংশে নিধন করিয়াছেন, যিনি দূর্বাদলশ্যাম পদ্মপলাশলোচন, যিনি সর্ব-গুণান্বিত লোকোত্তরচরিত।'

চিলিম্পা কহিলেন—'হে রামদাস, তুমি কি রামচন্দ্রের সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ?'

হনুমান্ জিহ্বা দংশন করিয়া কহিলেন—'আমার প্রভু একদারনিষ্ঠ। জনকতনয়া সীতা তাঁহার ভার্যা, যিনি মূর্তি-মতী কমলা, যাঁহার তুলনা ত্রিজগতে নাই। আমি নিজের জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি।'

চিলিম্পা কহিলেন—'তবে নিজের কথাই বল।'

হনুমান্ কহিলেন—'নিজের কীর্তি নিজে বলা ধর্ম-বিরুদ্ধ, কিন্তু পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি শত্রু ও প্রিয়ার নিকট আত্মগৌরব কথনে দোষ নাই। অতএব বলিতেছি

শ্রবণ কর। আমি সাগর লঙ্ঘন করিয়াছি, গন্ধমাদন উৎপাটিত করিয়াছি, ভগবান্ ভানুকে কক্ষপুটে রুদ্ধ করিয়াছি, এই দেখ স্ফোটকের চিহ্ন। আমি শতলক্ষ রাক্ষস বধ করিয়াছি, রাবণের মস্তকে চপেটাঘাত করিয়াছি, তাহার রথচূড়া চর্বণ করিয়াছি, এই দেখ একটি দন্ত ভাঙিয়া গিয়াছে।'

চিলিম্পা কহিলেন—'হে মহাবীর, তোমার বচন শুনিয়া আমার পরম প্রীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু স্ত্রীজাতি কেবল বীরত্ব চাহে না। তোমার কান্তগুণ কি কি আছে? তুমি নৃত্যগীত জান? কাব্য রচিতে পার?'

হনুমান্ কহিলেন—'অয়ি চিলিম্পে, রাবণবধের পর আমি অধীর হইয়া একবার নৃত্যগীতের উপক্রম করিয়াছিলাম, কিন্তু নল নীল প্রভৃতি বানরগণ আমাকে উপহাস করে, তাহাতে আমি নিরস্ত হই। সুমিত্রানন্দন তখন আমাকে বলেন—মারুতি, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। তুমি যাহা কর তাহাই নৃত্য, যাহা বল তাহাই গীত, যাহা না বল তাহাই কাব্য, ইতরজনের বুঝিবার শক্তি নাই।'

চিলিম্পা তাঁহার করধৃত কদলীগুচ্ছ লীলাসহকারে দংশন করিতে করিতে কহিলেন—'হে পবননন্দন, তুমি প্রেমতত্ত্বের কতদূর জান? তুমি কোন্ জাতীয় নায়ক? ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, প্রশান্ত না ললিত? তুমি কি করিয়া আমার মনোরঞ্জন করিবে, কি করিয়া আমার মানভঞ্জন করিবে? আমি যদি গজমুক্তার হার কামনা করি তবে তুমি

কোথায় পাইবে? যদি রাগ করিয়া আহার না করি তবে কি করিবে?'

হনুমান্ ভাবিলেন—'এই বিদগ্ধা বানরী এইবার আমাকে সংকটে ফেলিল, ইহার প্রশ্নের কি উত্তর দিব? যাহা হউক, আমি অপ্রতিভ হইব না।—হে সুন্দরী, তোমাকে দেখিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে, প্রেমতত্ত্বের ইহাই আমার প্রথম জ্ঞান। তুমি চিন্তা করিও না, কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব আমার অগ্রজ-তুল্য, তিনি আমাকে সমস্ত শিখাইয়া দিবেন। তুম্বরাজ চঞ্চরীক আমার বন্ধু, তিনিও আমাকে জ্ঞানদান করিবেন। তুমি যদি মুক্তাহার কামনা কর তবে জানকীর নিকট চাহিয়া লইব, যদি আহার না কর তবে এই লৌহকঠোর অঙ্গুলি দ্বারা তোমাকে খাওয়াইব। হে প্রিয়ে, আর বিলম্ব করিও না আমার সহিত চল। সীতা তোমার হনুমতী নাম দিয়াছেন, তিনি তোমাকে বরণ করিবার জন্য অযোধ্যায় প্রতীক্ষা করিতেছেন।'

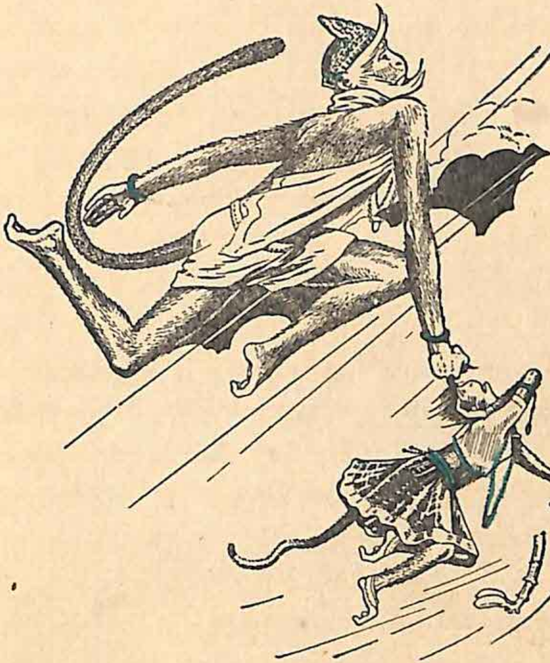
চিলিম্পা তখন হনুমানের চিবুকে তর্জনীর মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন—'ওরে বর্বর, ওরে অবোধ, ওরে বৃদ্ধবালক, তুমি প্রেমের কিছুই জান না। যাও, কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া সুগ্রীবকে পাঠাইয়া দাও।'

হনুমান্ আকুল হইয়া কহিলেন—'অয়ি নিষ্ঠুরে, আমাকে আশা দিয়া নিরাশ করিতেছ কেন? আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না।' এই বলিয়া তিনি চিলিম্পাকে ধরিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিলেন।

চিলিম্পা করতালি দিয়া বিকট হাস্য করিলেন। সহসা বনান্তরাল হইতে কালান্তক যমের ন্যায় দুই মহাকায় নরকপি নিঃশব্দে আসিয়া হনুমান্‌কে অতর্কিতে পাশবদ্ধ করিল। চিলিম্পা কহিলেন—'হে অরঙ্গ-অটঙ্গ, এই মর্কটের বড়ই স্পর্ধা হইয়াছে, দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ ছাঁটিয়া দিয়া ইহাকে বিতাড়িত কর।'

তখন প্রত্যুৎপন্নমতি হনুমান্ প্রভঞ্জনকে স্মরণ করিলেন। নিমেষে তাঁহার দেহ হিমাদ্রিতুল্য হইল, পাশ শতচ্ছিন্ন হইল, প্রচণ্ড পদাঘাতে নরকপিদ্বয় সাগরগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল প্রকম্পিত করিয়া মহাবীর উপ উপ রবে তিন বার সিংহনাদ করিলেন, তাহার পর চিলিম্পার কেশ গ্রহণপূর্বক 'জয় রাম' বলিয়া ঊর্ধ্বে লম্ফ দিলেন।

ঝঞ্ঝাবাহিত মেঘের ন্যায় হনুমান্ শূন্যমার্গে ধাবিত হইতেছেন। আকাশবিহারী সিদ্ধ-গন্ধর্ব-বিদ্যাধরগণ বলিতে লাগিল—'হে পবনাত্মজ, এতদিনে তোমার কৌমার দশা ঘুচিল, আশীর্বাদ করি সুখী হও।' দিগ্‌বধূগণ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'হে অঞ্জনানন্দন, মুহূর্তের তরে গতি সংবরণ কর, আমরা নববধূর মুখ দেখিব।' হনুমান্ হুংকার করিলেন, গগনচারিগণ ভয়ে মেঘান্তরালে পলায়ন করিল, দিগ্‌বধূগণ দিগ্‌বিদিকে বিলীন হইল।



'হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই'

চিলিম্পা কাতর কণ্ঠে কহিলেন—'হে মহাবীর, আমার কেশ ছাড়িয়া দাও, বড়ই লাগিতেছে। বরং আমাকে পৃষ্ঠে লও, নতুবা বক্ষে ধারণ কর।'

হনুমান্ বলিলেন—'চোপ!'

চিলিম্পা বলিলেন—'হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই। হে অরসিক, তুমি কি পরিহাস বুঝিতে পার নাই? আমি যে তোমা-বই আর কাহাকেও জানি না।'

হনুমান্ পুনরপি বলিলেন—'চোপ!'

নিম্নে কিষ্কিন্ধ্যা দেখা যাইতেছে। সুগ্রীব স্বল্পতোয়া তুঙ্গভদ্রার গর্ভে অষ্টাধিক-সহস্র পত্নীসহ জলকেলি করিতেছেন।

হনুমান্ মুষ্টি উন্মুক্ত করিলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। বানরী ঘুরিতে ঘুরিতে সুগ্রীবের স্কন্ধে নিপতিত হইল।

ভারমুক্ত হইয়া হনুমান্ দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হইলেন। পঞ্চবটী — জনস্থান — চিত্রকূট — শৃঙ্গবের — প্রয়াগ— অবশেষে অযোধ্যা।

সীতা সবিস্ময়ে বলিলেন—'একি বৎস! সংবাদ দাও নাই কেন? আমি নগরী সুসজ্জিত করিতাম, বাদ্যভাণ্ড প্রস্তুত রাখিতাম। হনুমতী কই?'

হনুমান্ অবনত মস্তকে বলিলেন—'মাতঃ, হনুমতীকে পাই নাই। আমি এক সামান্যা বানরী হরণ করিয়া সুগ্রীবকে দান করিয়াছি। হে দেবি, বিধাতা আমার



'জয় সীতারাম!'

এই বিশাল বক্ষে যে ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়াছেন তাহা তুমি ও রামচন্দ্র পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছ, দারাপুত্রের স্থান নাই।'

সীতা বলিলেন—'বৎস, পিতৃ-ঋণ শোধের কি করিলে?'

হনুমান্ মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন—'অহো

পাষণ্ড! আমি সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। জননি, তুমি এই বর দাও যেন অমর হইয়া চিরকাল পিতৃগণের পিণ্ডোদক বিধান করিতে পারি।'

সীতা বলিলেন—'বৎস, তাহাই হউক।'

তখন হনুমান্ পরিতুষ্ট হইয়া বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া ভুজদ্বয় ঊর্ধ্বে তুলিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন—'জয় সীতারাম!'

১৩৩৭

পুনর্মিলন

মহাকবি ভাস রচিত 'মধ্যম' নাটিকার আখ্যানভাগ কিঞ্চিৎ অদলবদল করিয়া বলিতেছি।

পঞ্চপাণ্ডব বিন্ধ্যাটবীতে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। মধ্যম পাণ্ডব একটু বেশী চঞ্চল ও দুঃসাহসিক, তাই দল হইতে ছিটকাইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সহসা একটি রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—'যুদ্ধং দেহি।'

রাক্ষসটি তরুণ, আষাঢ়ের সজলজলদতুল্য তাহার কান্তি, কণ্ঠস্বরে বাল্যের মধুরতা যৌবনের গাম্ভীর্য এখনও দ্বন্দ্ব করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া ভীমের মনে যুগপৎ বীর ও বাৎসল্য রসের সঞ্চার হইল। বলিলেন—'অয়ে বালক, তোমার সঙ্গে আমি লড়িব না, বরং তোমার পিতাকে ডাক।'

রাক্ষস ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'চাতুরী চলিবে না। হয় যুদ্ধ কর নতুবা পরাজয় স্বীকার করিয়া আমার সঙ্গে চল। আমার জননী ব্রতপালন করিয়া অভুক্তা আছেন,

আজ তাঁহার পারণা। একটি হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্য আনিতে বলিয়াছেন। তোমাকে বেশ স্থূলকায় দেখিতেছি, তোমার দ্বারাই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে।'

ভীমের কৌতূহল হইল। বলিলেন—'বেশ, চল।'

অনেক বনজঙ্গল গিরি নদী অতিক্রম করিয়া রাক্ষস ভীমকে একটি প্রকাণ্ড পর্বতগুহার দ্বারদেশে আনিল। ডাকিল—'মাতঃ, আহার্য উপস্থিত।'

ভিতর হইতে রাক্ষসী বলিল—'চিরজীবী হও বৎস, তোমাকে গর্ভে ধারণ করা সার্থক হইল।'

অতঃপর ভীম রোমাঞ্চিত হইয়া শুনিলেন রাক্ষসী তাহার এক চেটীকে বলিতেছে—'হঞ্জে, মনুষ্যটিকে বড় বড় করিয়া কর্তন কর। উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে কিঞ্চিৎ গন্ধক স্ফোটন দিয়া সন্তলন করিয়া নামাইও। বক্ষঃস্থল ও বাহুদ্বয় ছেলের জন্য রাখিও, পদদ্বয় তোমার, মুণ্ডটি আমি খাইব।'

রাক্ষস বলিল—'মাতঃ, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ কেমন শিকার আনিয়াছি।'

রাক্ষসী বলিল—'ও আর দেখিব কি। সব মানুষই সমান, ভাল করিয়া রাঁধিলে কে ঋষি কে চণ্ডাল টের পাওয়া যায় না। আমার এখন সময় নাই, চুল বাঁধিতেছি।'

রাক্ষস বলিল—'চুল বাঁধা এখন থাকুক, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ।'

পুত্রের নির্বন্ধাতিশয়ে রাক্ষসী গুহা হইতে নির্গত



'ছি ছি লজ্জায় মরি!'

হইয়া বাহিরে আসিল। ভীমকে দেখিয়া চমকিত হইয়া জিহবা দংশন করিয়া কহিল—'ওমা, আর্যপুত্র যে! ছি ছি লজ্জায় মরি! ওরে উন্মাদ, ওরে ঘটোৎকচ, প্রণাম কর বেটা।'

ভীম বলিলেন—'কে ও, দেবী হিড়িম্বা? প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।'

রাক্ষসী কি খাইল ভাস তাহা লেখেন নাই।

১৩৩৬

উপেক্ষিত

শহর ফতেহাবাদ, সময় অপরাহ্ণ। শাহজাদী জবরউন্নিসা দিলতোড়বাগ উদ্যানে একাকিনী বসিয়া আছেন। সমান্তরাল তরুশ্রেণীর শীর্ষে অস্তরাগ ঝিকমিক করিতেছে, ডালে ডালে হাজার বুলবুলের কাকলি, গোলাবের ফোয়ারায় রামধনুর রংবাহার, ফুলে ফুলে চারিদিক ছয়লাপ। শাহজাদীর হাতে একটি রবাব, তাহাতে তিনি কোমল গুঞ্জন তুলিয়া আপন মনে মৃদুস্বরে গাহিতেছেন। তাঁহার প্রিয় ব্যাঘ্র হেমকান্তি ফারুকশিয়র পদপ্রান্তে বসিয়া থাবা দিয়া তাল দিতেছে এবং মাঝে মাঝে স্বামিনীর বিজাপুরী জরিদার লাল চটিজুতা চাটিতেছে।

সহসা একটি পুরুষ মূর্তির আবির্ভাব। গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, বক্রাগ্র দাড়ি, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, কটিবন্ধে রত্নখচিত পিধানে নিহিত দামস্কসীয় তলবার। ইনিই সুবিখ্যাত কোফতা খাঁ, বাদশাহের সেনাপতি ও দক্ষিণহস্ত।

জবরউন্নিসা চমকিত হইয়া বলিলেন—'একি, কোফতা খাঁ, তুমি এখানে?'



শাহজাদী জবরউন্নিসা

সেনাপতি কহিলেন—'হাঁ সুন্দরী। আজ আমি একটা হেস্তনেস্ত করিতে চাই। তুমি বহুকাল আমাকে ছলনা

করিয়াছ, আজ জবান খ্যুলিয়া স্পষ্ট করিয়া বল আমাকে বিবাহ করিবে কি না।'

জবরউন্নিসা কন্দর্পচাপতুল্য তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'বেওকুফ, তুমি কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ? ছিলে নগণ্য কিজিলবাশ ক্রীতদাস, আজ বাদশাহের দয়ায় সেনাপতি হইয়াছ। বস্, ঐখানেই ক্ষান্ত হও, অধিক ঊর্ধ্বে নজর দিও না।'

কোফতা খাঁ যথোচিত ভীষণতা সহকারে একটি অট্টহাস্য হাসিলেন। বলিলেন—'শাহজাদী, কে তোমার পিতাকে তখ্‌তে চড়াইয়াছে? মারহাট্টার আক্রমণ কে বারংবার রোধ করিয়াছে? কাহার অনুগ্রহে তোমার এই ভোগৈশ্বর্য, এই হীরাজহরৎ, এই লীলা-উদ্যান, এই হাজার-বুলবুল-মুখরিত বুস্তাঁ? ইন্‌শাল্লাহ্! জান, একটি অঙ্গুলির হেলনে সমস্ত ভূমিসাৎ করিতে পারি? আজ হিন্দুস্তানের প্রকৃত মালিক কে? তোমার অক্ষম পিতা, না এই মহাবীর রুস্তম-ই-হিন্দ্ কোফতা খান ফতে জঙ্গ্?'

জবরউন্নিসা বলিলেন—'কুত্তার গর্দানে লোম গজাইলেই সে সিংহ হয় না।'

সেনাপতি কহিলেন—'বিস্‌মিল্লাহ্! এ কথা আর কেহ বলিলে এই মুহূর্তে তাহাকে কতল করিতাম। কিন্তু তুমি আমার দিল গিরিফতার করিয়াছ, এবারকার মত মাফ

করিলাম। যাহা হউক, এখনও বল তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী হইবে কি না।'

জবরউন্নিসা মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন—'কোফতা খাঁ, তুমি কি কবি হাফেজের সেই বয়েতটি জান না?—কুকুর বারংবার ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু সিংহী একবারই গর্জায়।'

ইহার পর কোনও পুরুষই স্থির থাকিতে পারে না, বিশেষত সেই দারুণ মুঘল যুগে। কোফতা খাঁ হুংকার করিয়া কহিলেন—'ইল্‌হম্‌দলিল্লাহ্‌! শাহজাদী, তবে আল্লার নাম স্মরণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।' কোষ হইতে সড়াক করিয়া অসি নির্গত হইল।

'কোফতা খাঁ, তুমি আমাকে নিতান্তই হাসাইলে!' এই বলিয়া শাহজাদী অন্যমনস্কভাবে গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিলেন—'চল্‌ চল্‌ চম্বেলীবাগ পর মেরা বাঘকো খিলাওয়েংগি।'

অসহ্য। কোফতা খাঁর নিষ্ঠুর হস্তে উদ্যত তলবার ঝলকিয়া উঠিল। সহসা শূন্যে যেন সৌদামিনী খেলিল, একটি হিল্লোলিত কাঞ্চনকায়া নিমেষের তরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার ভূতলে পড়িল। একটু অস্ফুট আর্তনাদ, একটু ছটফটানি, তাহার পর সব শেষ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে। জবরউন্নিসা তখন যন্ত্রে ঝংকার তুলিয়া গাহিতেছেন—'আয়সে বেদরদীকে পালে পড়ী হুঁ।' তাঁহার পোষা বাঘটি ভোজন সমাপ্ত করিয়া

পরম তৃপ্তির সহিত সৃক্বণী পরিলেহন করিতেছে। তাহার বাঁয়ে কোফতা খাঁর পাগড়ি, ডাহিনে ছিন্ন ইজার কাবা জোব্বা, সম্মুখে কিঞ্চিৎ হাড়।

১৩৩৬

উপেক্ষিতা

তিন নম্বর রোডোডেন্‌ড্রন রোড, বালিগঞ্জ। বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। ড্রইংরুমে পিয়ানোর কাছে উপবিষ্ট গরিমা গাঙ্গুলী, তাহার সম্মুখে ইজিচেয়ারে চটক রায়। ঘরে আসবাব বেশী নাই, কারণ গরিমার বাবার ঢাকায় বদলির হুকুম আসিয়াছে, অধিকাংশ জিনিস প্যাক হইয়া আগেই রওনা হইয়া গিয়াছে।

এই চটক ছেলেটি যেমন ধনী তেমনই মিষ্টভাষী বিনয়ী বাধ্য, চিমটি কাটিলেও টুঁ শব্দ করে না—যাহাকে বলে নারীর মনুষ্য অর্থাৎ লেডিজ ম্যান। না হইবে কেন, সে যে পাঁচ বৎসর বিলাতে থাকিয়া সেরেফ এটিকেট অধ্যয়ন করিয়াছে। এমন সুপাত্র আজকালকার বাজারে দুর্লভ। গরিমার পিতা-মাতা কলিকাতা ত্যাগের পূর্বেই কন্যাকে বাগ্‌দত্তা দেখিতে চান, তাই তাঁহারা যাত্রার পূর্বসন্ধ্যায় ভাবী দম্পতিকে বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ দিয়া দোতলায় বসিয়া সুসংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কিন্তু আলাপ তেমন জমে নাই। গোটা-পনর গান শেষ করিয়া গরিমা তৃতীয়বার জানাইল—‘কাল আমরা যাচ্ছি।’

চটক বলিল—'ও।'

হায় রে, বিদায়বার্তার এই কি উত্তর! গরিমার কথা জোগাইতেছে না। অগত্যা বলিল—'সেই ভুটানী গজলটা গাইব কি?'

'নাঃ, এইবার ওঠা যাক।'

'সেকি হয়, আগে বৃষ্টি থামুক।'

চটক চেয়ারে বসিয়া নীরবে উশখুশ করিতে লাগিল। মিনিট-দুই পরে আবার বলিল—'এইবার উঠি।'

গরিমা ভাবিতেছিল, কবি বৃথাই লিখিয়াছেন—'এমন দিনে তারে বলা যায়।' এই বাদল সন্ধ্যা কি নিষ্ফল হইবে? চটকের কী হইল? কেন সে পালাইতে চায়? তাহার কিসের অস্বস্তি, কিসের অস্থিরতা? গরিমার মোহিনীশক্তি আজ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। সেই ভেটকি-মুখী বেহায়া মেনী মিত্তিরটা চটককে হাত করে নাই তো? হবেও বা, যা গায়ে পড়া মেয়ে! গরিমা তাহার কণ্ঠাগত ক্রন্দন গিলিয়া ফেলিয়া বলিল—'আর একটু বসুন।'

কিন্তু চটক বসিল না। চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—'নাঃ, চললুম, গুডনাইট।'

বৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন ঝমঝমানি ভেদ করিয়া চটকের মোটর গুঞ্জরিয়া উঠিল। গেল, যাহা বলিবার তাহা না বলিয়াই চলিয়া গেল—ভোঁপ, ভোঁপ—দূরে, বহু দূরে।

গরিমা কাঁদিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চটকের পরিত্যক্ত



দেহলতা এলাইয়া দিল

চেয়ারে দেহলতা এলাইয়া দিল। তাহার পরেই এক লাফ। ভীষণ সত্য সহসা প্রকট হইল। বেচারা চটক!

চেয়ারে অগনতি ছারপোকা।

১৩৩৬

গুরুবিদায়

বৈকালিক প্রসাধনের পর মানিনী দেবী একটি বড় আরশির সামনে দাঁড়াইয়া নিজের অঙ্গশোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় একজোড়া গোঁফের প্রতিবিম্ব তাঁহার কাঁধের উপর ফুটিয়া উঠিল।

উক্ত গোঁফের মালিক তাঁহার স্বামী রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিদার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বেলিয়াঘাটা। মানিনী একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় না ফিরাইয়াই বলিলেন—'কি সুখেই যে মোটা হচ্ছি!"

বংশলোচন রসিকতার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—'কেন, সুখের কমটাই বা কি, অমন যার স্বামী!'

মানিনী যদি সামান্য পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোক হইতেন তবে হয়তো বলিয়া ফেলিতেন—পোড়াকপাল অমন স্বামীর। কিন্তু তাঁহার বাক্‌সংযম অভ্যাস আছে, সেজন্য বলিলেন—'স্বামী তো খুবই ভাল, আমিই যে মন্দ।'

কথার ধারা গহন অরণ্যের দিকে মোড় ফিরিতেছে দেখিয়া বংশলোচন নিপুণ সারথির ন্যায় বলিলেন—'কি যে বল তার

ঠিক নেই। কিসের অভাব তোমার? হুকুম করলেই তো হয়।'

মানিনী এইবার স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'বয়েস তো বেড়েই চলেছে, ধম্মকম্ম কিছুই হ'ল না।'

বংশলোচন বলিলেন—'কেন, এই যে আর বৎসর গয়া কাশী বৃন্দাবন আগ্রা দিল্লি ক'রে এলে?'

'ভারী তো, তার ফল আর কদিন টিকবে। ইচ্ছে হয় মন্তরটন্তর নি।'

'তা বেশ তো, সে তো খুব ভাল কথা। আমি চাটুজ্যে মশায়ের সঙ্গে এখনই পরামর্শ করছি।'

কিন্তু বংশলোচনের মন বলিতে লাগিল যে কথাটি মোটেই ভাল নয়। ইঁহাদের বাইশ বৎসর ব্যাপী দাম্পত্যজীবনে অসংখ্যবার প্রীতির শৃঙ্খল মেরামত করিতে হইয়াছে, কিন্তু বংশলোচনের প্রাধান্য এ পর্যন্ত মোটামুটি বজায় আছে। পত্নীর গুরুভক্তি যদি প্রবলা হইয়া ওঠে তবে স্বামীর আসন কোথায় থাকিবে? গুরু যদি কেবল অখণ্ডমণ্ডলাকারের পদটি দেখাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হন তবে কোনও আপত্তির কারণ থাকে না। কিন্তু গুরু যদি নিজেই ঐ পদটি দখল করিয়া বসেন তবেই চিন্তার কথা। মুশকিল এই যে, ধর্মের ব্যাপারে ঈর্ষা অভিমান শোভা পায় না। তবে এক হিসাবে তাঁহার পত্নীর এই নূতন শখটি নিরাপদ। মানিনী দেবী অত্যন্ত একগুঁয়ে মহিলা। যদি দেশের বর্তমান হুজুগের বশে তাঁহার পিকেটিং

করিবার বা প্রভাতফেরি গাহিবার ঝোঁক হইত তবে বংশলোচনের মান-ইজ্জৎ অনারারি হাকিমি কোথায় থাকিত? তাঁহার মুরুব্বী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই বা কি বলিতেন? মোটের উপর দেশভক্তির চেয়ে গুরুভক্তিতে ঝঞ্ঝাট ঢের কম।

বংশলোচন বৈঠকখানায় আসিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গগণের নিকট পত্নীর অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'বউমার সংকল্প অত্যন্ত সাধু, তবে একটি সদ্‌গুরু দরকার। তোমাদের পৈতৃক গুরুর কুলে কেউ বেঁচে নেই?'

বংশলোচন বলিলেন—'শুনেছি একটি গুরুপুত্তুর আছেন, তিনি থিয়েটারে আবদালা সাজেন।'

'রাধামাধব! আচ্ছা, আমাদের গুরুপুত্তুরটিকে একবার দেখলে পার। সেকেলে মানুষ, শাস্ত্রটাস্ত্র জানেন না বটে, কিন্তু পৈতৃক ব্যবসাটি বজায় রেখেছেন।'

উকিল বিনোদবাবু বলিলেন—'চাটুজ্যে মশায়, আপনি এখনও সত্যযুগে আছেন। আজকাল আর সেকেলে গুরুর চলন নেই যিনি বছরে বার-দুই শিষ্যবাড়ি পায়ের ধুলো দেন আর পাঁচ সের চাল, পাঁচ পো চিনি, গোটা দশেক টাকা লাট্টু-মার্কা থান ধুতিতে বেঁধে প্রস্থান করেন। এখন এমন গুরু

চাই যাঁর চেহারা দেখলে মন খুশী হয়, বচন শুনলে প্রাণ আনচান করে।'

বংশলোচনের ভাগনে উদয় বলিল—'মামাবাবু যদি মামীকে মুরগি ধরাতেন তবে আর এসব খেয়াল হ'ত না। তাইজন্যেই তো আমার শাশুড়ী মন্তর নিতে পারছেন না।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'ছাই জানিস উদো। উপেন পালের নাম শুনেছিস ? সেবার মধুপুরে গিয়ে দেখলুম—প্রকাণ্ড বাড়ি, দশ বিঘে বাগান, দশটা গাই, এক পাল মুরগি। রাজর্ষির চালে থাকেন, ঘরের তরি-তরকারি, ঘরের দুধ, ঘরের মুরগি। সস্ত্রীক ধর্ম আচরণ করেন, সঙ্গে চার জন গুরু হামেহাল হাজির, নিজের দুজন, স্ত্রীর দুজন।'

উপযুক্ত গুরু কে আছেন এই লইয়া অনেকক্ষণ আলোচনা হইল। পর্বতবাসী সন্ন্যাসী, আশ্রমবাসী মহারাজ, স্বচ্ছন্দচারী লেংটাবাবা, বৈজ্ঞানিক মহাপুরুষ, উদারপন্থী আধুনিক সাধু—অনেকের নাম উঠিল। কিন্তু মুশকিল এই, বংশলোচন যাঁহাকে উপযুক্ত অর্থাৎ নিরাপদ মনে করেন, গৃহিণীর হয়তো তাঁহাকে পছন্দ হইবে না।

এমন সময় বংশলোচনের শালা নগেন দোতলা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল—'আপনারা আর মাথা ঘামাবেন না, দিদি গুরু ঠিক ক'রে ফেলেছেন।'

বংশলোচন ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে ?'

'বালিগঞ্জের খর্বিদং স্বামী। অ্যাসা সুন্দর গাইতে

পারেন! চেহারাটিও তেমনি, বয়েস এই জামাইবাবুর চেয়ে কিছু কম হবে। শুনেছি ছেলেবেলা থেকেই একটা উদাস উদাস ভাব ছিল, টেনিস খেলতে খেলতে কতবার অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। সংসারে যদ্দিন ছিলেন, নাম ছিল পরান সরকার। তারপর স্ত্রীবিয়োগ হতেই স্বামী হয়েছেন। এখন তাঁর প্রায় দু-শ শিষ্য, চার-শ শিষ্যা।'

'একবারে সব ঠিক হয়ে গেছে নাকি?'

'উঁহু, দিদি তাতে চালাক আছেন। কাল স্বামীজীকে নিয়ে আসছি, এখানে হপ্তা-খানিক জাঁকড়ে থাকবেন, যাকে বলে প্রোবেশন। তারপর দিদির যদি ভক্তিটক্তি হয় তবে মন্তর নেবেন।'

চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'অতি উত্তম ব্যবস্থা। গুরুটির সন্ধান দিলে কে?'

নগেন বলিল—'আমিই দিয়েছি। আমার বন্ধুদের মহলে ওঁর খুব খ্যাতি। আপনারাও দেখলে মোহিত হয়ে যাবেন।'

পরদিন খল্বিদং স্বামীর শুভাগমন হইল, সঙ্গে কেবল একটি কমণ্ডলু আর একটি বড় সুটকেস। নগেন মিথ্যা বলে নাই, টকটকে গৌরবর্ণ, চাঁচর ঝাঁকড়া চুল, মধুর কণ্ঠস্বর, চোখে একটা অপূর্ব প্রতিভান্বিত ঢুলঢুলু ভাব! ছ-শ শিষ্য হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

মানিনী দেবী প্রত্যহ শুদ্ধাচারে ভাবী গুরুদেবের সেবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর নিত্যকর্মপদ্ধতি একেবারে ধরাবাঁধা। সকালবেলা অনুপানসহ তিন পাথরবাটি চা, দ্বিপ্রহরে পবিত্র অন্নব্যঞ্জন, তাহার পর ঘণ্টা তিন-চার যোগনিদ্রা, বিকালে নানাপ্রকার ফলমূল মিষ্টান্ন, পুনর্বার চা, সন্ধ্যায় মধুরকণ্ঠে ধর্মব্যাখ্যা, সংগীত ও ঘুঙুর পরিয়া ভাব-নৃত্য, রাত্রে সাত্ত্বিক লুচি পোলাও কালিয়া।

মানিনীর অন্তরে একটা সাড়া পড়িয়াছে। নভেল পড়া, লেস বোনা, ছাঁটা পশমের আসন তৈয়ারি প্রভৃতি সাংসারিক কার্যে আর তাঁহার মন নাই। প্রথম দিনেই তিনি নিজের হাতে স্বামীজীর উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিলেন। দ্বিতীয় দিনে পাতে প্রসাদ পাইলেন। তৃতীয় দিনে বংশলোচন রোমাঞ্চিত হইয়া দেখিলেন—খল্বিদংএর চর্বিত আকের ছিবড়া মানিনী পরম ভক্তি সহকারে চুষিতেছেন। বংশলোচন বারংবার স্বামীজীর বাণী স্মরণ করিতে লাগিলেন—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এ সমস্তই ব্রহ্ম—কিন্তু মন প্রবোধ মানিল না। ব্রহ্ম নিখিল চরাচরে থাকিতে পারেন, কিন্তু আকের ছিবড়ায় থাকিবেন কোন্ দুঃখে? একথা মনে করিতেই চিত্ত বিদ্রোহী হয়, পিত্ত চটিয়া ওঠে। ছি ছি বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না, তোবা তোবা বলিতে ইচ্ছা করে।

চাটুজ্যে মহাশয় শুনিয়া বলিলেন—'তাইতো, বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এই নগেনটাই যত নষ্টের গোড়া। দেশী

ঠাকুরমশায় তোর দিদির মনে না ধরে তো একটা জটাধারী গাঁজাখোর আনলেই তো পারতিস।'

নগেন বলিল—'বা রে, আমি কেমন ক'রে জানব যে দিদির অত ভক্তি হবে?'

বংশলোচন কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখন কি করা যায়?'

বিনোদ বলিলেন—'একটা ভৈরবী-টৈরবী ধ'রে এনে তুমিও সাধনা শুরু কর, বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাক। আর যদি সাহস থাকে তবে গিন্নীকে মনের কথা খুলে বল, খল্বিদংকে অর্ধচন্দ্রং দাও।'

নগেন বলিল—'তা হ'লে দিদি ভয়ংকর চটবে।'

কথাটা ভয়ংকর সত্য, পত্নীর ধর্মাচরণে বাধা দেওয়া সহজ কথা নয়। বংশলোচন অকূল চিন্তাসাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। এমন যে বিচক্ষণ চাটুজ্যে মহাশয় আর তীক্ষ্নবুদ্ধি বিনোদ উকিল, ইঁহারাও প্রতিকারের কোনও সুসাধ্য উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না। হায় হায়, কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

মানিনী মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, খল্বিদংকেই গুরুত্বে বরণ করিবেন। কাল সকালে দীক্ষা। বাড়ির পূর্বদিকে সংলগ্ন যে মাঠটি আছে তাহাতে একটি বেদী রচনা

করিয়া চারিদিকে ফুলের টব দিয়া সাজানো হইয়াছে। আজ বৈকালে খল্বিদং নিজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত আয়োজন তদারক করিতেছেন। বংশলোচন, চাটুজ্যে, বিনোদ ইত্যাদি পিছনে পিছনে আছেন, মানিনীও একটু তফাতে থাকিয়া সমস্ত দেখিতেছেন।

খল্বিদং গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে পায়চারি করিতেছেন এমন সময় তাঁহার নজরে পড়িল—মাঠের শেষ দিকে একটি বৃহদাকার ছাগল তাঁহাকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। এই ছাগলটি লম্বকর্ণ নামে খ্যাত। সে যখন ছোট ছিল তখন বংশলোচন তাহাকে বেওয়ারিস অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়া বাড়িতে আনেন। সেই অবধি সে পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং মানিনীর অত্যধিক আদর পাইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার নবীন যৌবন। লম্বকর্ণ যদি মনুষ্য হইত তবে এ বয়সে তাহাকে তরুণ বলা চলিত। কিন্তু সে অজত্বের অভিশাপ লইয়া জন্মিয়াছে, তাই লোকে তাহাকে বলে বোকাপাঁঠা।

খল্বিদং স্বামী লম্বকর্ণকে দেখিয়া প্রসন্ন বদনে বলিলেন—'শ্রীভগবানের কি অপূর্ব সৃষ্টি এই জীবটি! বেঁচে থাকার যে আনন্দ, তা এতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। প্রাণশক্তি যেন সর্বাঙ্গে উথলে উঠছে।'

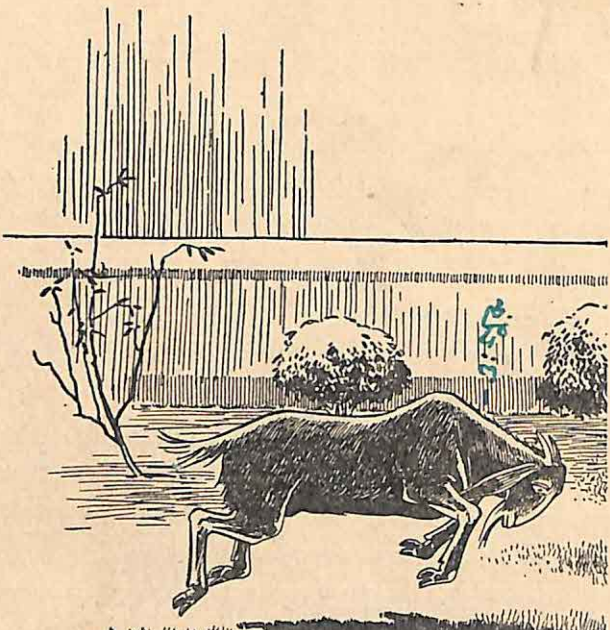
স্বামীজী মাঠের নরম ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং এক মুঠা ঘাস ছিঁড়িয়া লইয়া ডাকিলেন—'আ—তু তু তু!'

লম্বকর্ণ আসিল না, স্বামীজীর দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে পিছু হটিতে লাগিল।

স্বামীজী সহাস্যে বলিলেন—'আহা, অবোধ জীব, কিঞ্চিৎ ভীত হয়েছে, আমাকে এখনও চেনে না কিনা। তোমরা ওকে তাড়া দিও না, জীবকে আকর্ষণ করবার উপায় হচ্ছে অসীম করুণা, অগাধ তিতিক্ষা। আ—তু তু তু!'

লম্বকর্ণ ভীত হইবার ছেলে নয়। আসল কথা, প্রথম দর্শনেই খল্বিদংএর উপর তাহার একটা অহৈতুকী অভক্তি জন্মিয়াছে। আজ তাঁহার মুখের মধুর হাসিটুকু দেখিয়া সেই অহৈতুকী অভক্তি অকস্মাৎ একটা বেয়াড়া বদখেয়ালে পরিণত হইল। লোকে যাহাই বলুক, লম্বকর্ণ মোটেই বোকা নয়। ছাগল হইলে কি হয়, তাহার একটা সহজাত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আছে। লম্বকর্ণ কলেজে পড়ে নাই, পাস করে নাই, তথাপি তাহার জানা আছে যে বেগ আহরণ করিতে হইলে যথাসম্ভব দূর হইতে ধাবমান হওয়াই যুক্তিসংগত। আরও জানা আছে যে তাহার দেহের দেড়মন মাংসকে যদি তাহার বেগের অঙ্ক দিয়া গুণ করা হয় তবে যে বৈজ্ঞানিক রাশি উৎপন্ন হয় তাহার ধাক্কা সামলানো মানুষের অসাধ্য।

কিছুদূর পিছু হাঁটিয়া লম্বকর্ণ এক মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ঘাড় নীচু করিয়া শিং বাঁকাইয়া স্বামীজীর নধর উদর নিশানা করিয়া নক্ষত্রবেগে সম্মুখে ছুটিল।



নক্ষত্রবেগে সম্মুখে ছুটিল

স্বামীজীর মুখে প্রসন্ন হাসি তখনও লাগিয়া আছে, কিন্তু আর সকলে ব্যাপারটি বুঝিয়া লম্বকর্ণকে নিরস্ত করিবার জন্য ত্রস্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু কার সাধ্য রোধে তার গতি! নিমেষের মধ্যে লম্বকর্ণের প্রচণ্ড গুঁতা ধাঁই করিয়া



কার সাধ্য রোধে তার গতি

লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিল, খল্বিদং একবার মাত্র বাবা গো বলিয়া ডিগবাজি খাইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—'শুধু বোরিক কমপ্রেস। পেট ফুটো হয় নি, চোটও বেশী লাগে নি তবে শক-টা খুব খেয়েছেন। একটু পরেই উঠে বসতে পারবেন, তখন আবার দু-ড্রাম ব্রাণ্ডি। ব্যথাটা সারতে দিন-পনর লাগবে।'

ডাক্তার অত্যুক্তি করেন নাই। কিছুক্ষণ পরেই খল্বিদং চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—'ছাগলটা গেল কোথায় ?'

বিনোদবাবু বলিলেন—'সেটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, আপনার কোনও ভয় নেই।'

স্বামীজী বলিলেন—'ভয় আমি কোনও শালার করি না। কিন্তু ছাগলটাকে এক্ষুনি মেরে তাড়াতে হবে, ওটা মূর্তিমান পাপ।'

বিনোদবাবু বলিলেন—'বলেন কি মশায়, আপনারা হলেন করুণার অবতার, পাপীকে যদি ক্ষমা না করেন তবে বেচারা দাঁড়ায় কোথা ? আর লম্বকর্ণের স্বভাবটা তো হিংস্র নয়, আজ বোধ হয় হঠাৎ কিরকম ব্লাড-প্রেশার বেড়ে গিয়ে মাথা গরম হয়ে—কি বলেন ডাক্তারবাবু ?'

উদয় বলিল—'বউ আজ ওকে একছড়া গাঁদাফুলের মালা খাইয়েছে, তাইতে বোধ হয়।'

খল্বিদং ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—'ও-সব আমি শুনতে চাই না। এ বাড়িতে দুজনের স্থান নেই, হয় আমি, নয় ঐ ব্যাটা।'

বংশলোচন দুরুদুরু বক্ষে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন —'কি বল? ছাগলটাকে তা হ'লে বিদেয় করা যাক?'

মানিনী সবেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—'বাপরে, সে আমি পারব না।' এই কথা বলিয়াই তিনি সটান দোতলায় গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বংশলোচনের এক জোড়া ছেঁড়া মোজা মেরামত করিতে লাগিয়া গেলেন।

খল্বিদং বলিলেন—'তা হ'লে আমিই বিদায় হই।

চাটুজ্যে মহাশয় স্বামীজীর পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন —'যা বলেছ দাদা। এই নির্বান্ধব পুরে দুশমনের হাতে কেন প্রাণটা খোয়াবে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, বেঁচে থাকলে অনেক শিষ্য জুটবে। এস, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি।'

বংশলোচন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলেন— স্ত্রীচরিত্র কি অদ্ভুত জিনিস।

১৩৩৭

মহেশের মহাযাত্রা

কেদার চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন,—'আজকাল তোমরা সামান্য একটু বিদ্যে শিখে নাস্তিক হয়েছ, কিছুই মানতে চাও না। যখন আরও একটু শিখবে তখন বুঝবে যে আত্মা আছেন। ভূত, পেতনী—এ'রাও আছেন। বেহ্মদত্যি, কন্ধকাটা—এ'য়ারাও আছেন।'

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তাঁহার শালা নগেন বলিল,—'আচ্ছা বিনোদ-দা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

বিনোদবাবু বলিলেন—'যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস ক'রব। তার আগে হাঁ-না কিছুই বলতে পারি না।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর! বলি, তোমার প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছ? ম্যাকডোনাল্ড, চার্চিল আর বাল্‌ডুইনকে দেখেছ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মাতামাতি কর কেন?'

'আচ্ছা আচ্ছা, হার মানছি চাটুজ্যে মশায়।'

'আপ্তবাক্য মানতে হয়। আরে, প্রত্যক্ষ করা কি যার তার কম্ম? শ্রীভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের বলেন—দিব্যং

দদামি তে চক্ষুঃ। সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।'

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি দেখতে পেয়েছেন চাটুজ্যে মশায় ?'

'জ্যাঠামি করিস নি। এই কলকাতা শহরে রাস্তায় যারা চলাফেরা করে—কেউ কেরানী, কেউ দোকানী, কেউ মজুর, কেউ আর কিছু—তোমরা ভাব সবাই বুঝি মানুষ। তা মোটেই নয়। তাদের ভেতর সর্বদাই দু-দশটা ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্কর। এই রকম ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন মহেশ মিত্তির।'

'কে তিনি?'

'জান না? আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মামার শালা। এককালে তিনি কিছুই মানতেন না, কিন্তু শেষ দশায় তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছিল।'

সকলে একবাক্যে বলিলেন—'কি হয়েছিল বলুন না চাটুজ্যে মশায়!'

চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকাটি হাতে তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। মহেশ মিত্তির তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসারি করতেন। অঙ্কের প্রফেসর, অসাধারণ বিদ্যে, কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক। ভগবান আত্মা পরলোক কিছুই মানতেন না। এমন কি, স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেন নি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, বলতেন—শুয়োর না খেলে হিঁদুর উন্নতির আশা নেই, ওটা বাদ দিয়ে কোনও জাত বড় হ'তে পারে নি। মহেশের চালচলনের জন্য আত্মীয়স্বজন তাঁকে একঘরে করেছিল। কিন্তু যতই অনাচার করুন তাঁর স্বভাবটা ছিল অকপট, পারতপক্ষে মিথ্যা কথা কইতেন না। তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন হরিনাথ কুণ্ডু, তিনিও ঐ কলেজের প্রফেসর, ফিলসফি পড়াতেন। কিন্তু বন্ধু হ'লে কি হয়, দুজনে হরদম ঝগড়া হ'ত, কারণ হরিনাথ আর কিছু মানুন না মানুন ভূত মানতেন। তা ছাড়া মহেশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কেউ তাঁকে হাসতে দেখে নি, আর হরিনাথ ছিলেন আমুদে লোক, কথায় কথায় ঠাট্টা ক'রে বন্ধুকে উদ্‌ব্যস্ত করতেন। তবু মোটের ওপর তাঁদের পরস্পরের প্রতি খুব একটা টান ছিল।

তখন রাজনীতিচর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকারা হয় নি, দু-একটা পাস করতে পারলে যেমন-তেমন চাকরি জুটে যেত।

লোকের তাই উঁচুদরের বিষয় আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা ক'রত—বউ ভালবাসে কি বাসে না। যাদের সে সন্দেহ মিটে গেছে, তারা মাথা ঘামাত—ভগবান আছেন কি নেই। একদিন কলেজে কাজ ছিল না, অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। গল্পের আরম্ভ যা নিয়েই হোক, মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে নিয়ে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন, কারণ এই নিয়ে তর্ক করাই তাঁদের অভ্যাস। এদিনও তাই হয়েছিল।

আলোচনা শুরু হয় ঝি-চাকরের মাইনে নিয়ে। কলেজের পণ্ডিত দীনবন্ধু বাচস্পতি মশায় দুঃখ করছিলেন—'ছোটলোকের লোভ এত বেড়ে গেছে যে আর পেরে ওঠা যায় না।' মহেশবাবু বললেন—'লোভ সকলেরই বেড়েছে, আর বাড়াই উচিত, নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে।' পণ্ডিত মশায় উত্তর দিলেন—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মহেশবাবু পাল্‌টা জবাব দিলেন—'লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না।'

তর্কটা তেমন জুতসই হচ্ছে না দেখে হরিনাথবাবু একটু উসকে দেবার জন্য বললেন—'আমাদের মতন লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর। মাইনে তো পাই মোটে পৌনে দু-শ, তাতে ইহকালের কটা শখই বা মিটবে। তাইতো পরকালের আশায় ব'সে আছি, আত্মাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফুর্তি করতে পারে।'

দীনবন্ধু পণ্ডিত বললেন—'কে বললে তুমি স্বর্গে যাবে? আর স্বর্গের তুমি জানই বা কি?'

'সমস্তই জানি পণ্ডিত মশায়। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলুকুলু বইছে, তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ। সবুজ মাঠের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সব রকম ফ'লে আছে, ছেঁড় আর খাও। জন-কতক ছোকরা-দেবদূত গোলাপী উড়ুনি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে ব'সে রয়েছে, চাইলেই ফটাফট খুলে দেবে। ঐ হোথা কুঞ্জবনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুদণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিচ্ছু বলবে না। যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কালোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তানায় যাও।'

মহেশবাবু বললেন—'সমস্ত গাঁজা। পরলোক আত্মা ভূত ভগবান কিছুই নেই। ক্ষমতা থাকে প্রমাণ কর।'

তর্ক জ'মে উঠল। প্রফেসররা কেউ এক পক্ষে কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালেন। পণ্ডিত মশায় দারুণ অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে ব'সে রইলেন। বৃদ্ধ প্রিনসিপাল যদু সাণ্ডেল রফা ক'রে বললেন—'ভূতের তেমন দরকার দেখি না, কিন্তু আত্মা আর ভগবান বাদ দিলে চলে না।' মহেশ মিত্তির বললেন—'কেউ-ই নেই, আমি দশ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি।' হরিনাথ কুণ্ডু মহা উৎসাহে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন—'লেগে যাও।'

তারপর মহেশবাবু ফুলস্কাপ কাগজ আর পেনসিল নিয়ে একটি বিরাট অঙ্ক কষতে লেগে গেলেন। ঈশ্বর আত্মা আর ভূত—এই তিন রাশি নিয়ে অতি জটিল অঙ্ক, তার গতি বোঝে কার সাধ্য। বিস্তর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ক'রে হাতির শুঁড়ের মতন বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন—ঈশ্বর = 0, আত্মা = ভূত = $\sqrt{0}$।

বাচস্পতি বললেন—'বদ্ধ উন্মাদ।'

মহেশবাবু বললেন—'উন্মাদ বললেই হয় না। এ হ'ল গিয়ে দস্তুরমত ইণ্টিগ্রাল ক্যালকুলস। সাধ্য থাকে তো আমার অঙ্কের ভুল বার করুন।'

হরিনাথ বললেন—'অঙ্ক-টঙ্ক আমার আসে না। বাচস্পতি মশায় যদি ভগবান দেখাবার ভার নেন তো আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি।'

বাচস্পতি বললেন—'আমার ব'য়ে গেছে।'

মহেশবাবু বললেন—'বেশ তো হরিনাথ তুমি ভূতই দেখাও না। একটার প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেনে নিতে রাজী আছি।'

হরিনাথবাবু বললেন—'এই কথা? আচ্ছা, আসছে হপ্তায় শিবচতুর্দশী পড়ছে। সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে চল, পষ্টাপষ্টি ভূত দেখিয়ে দেব। কিন্তু যদি কোন বিপদ ঘটে তো আমাকে দুষতে পারবে না।'

'যদি দেখাতে না পার?'

'আমার নাক কেটে দিও। আর যদি দেখাতে পারি তো তোমার নাক কাটব।'

প্রিন্সিপাল যদু সাণ্ডেল বললেন—'কাটাকাটির দরকার কি, সত্যের নির্ণয় হ'লেই হ'ল।'

শিবচতুর্দশীর রাত্রে মহেশ মিত্তির আর হরিনাথ কুণ্ডু মানিকতলায় গেলেন। জায়গাটা তখন বড়ই ভীষণ ছিল, রাস্তায় আলো নেই, দু-ধারে বাবলা গাছে আরও অন্ধকার করেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। হোঁচট খেতে খেতে দুজনে নতুন খালের ধারে পোঁছলেন। বছর-দুই আগে ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল, এখনও তার গোটাকতক খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

মহেশ মিত্তির অবিশ্বাসী সাহসী লোক, কিন্তু তাঁরও গা ছমছম করতে লাগল। হরিনাথ সারা রাস্তা কেবল ভূতের কথাই কয়েছেন—তারা দেখতে কেমন, মেজাজ কেমন, কি খায়, কি পরে। দেবতারা হচ্ছেন উদারপ্রকৃতি দিলদরিয়া, কেউ তাঁদের না মানলেও বড়-একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো ব'লে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধ'রে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন। এই সব কথা

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোনও অশরীরী বেরাল তার পলাতকা প্রণয়িনীকে আকুল আহ্বান করছে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন, একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কাল মূর্তি দু-হাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটু দূরে ঐ রকম আরও দুটো।

হরিনাথবাবু থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'রাম রাম সীতারাম! ও মহেশ, দেখছ কি, তুমিও বল না!'

আর একটু হ'লেই মহেশবাবু রামনাম উচ্চারণ ক'রে ফেলতেন, কিন্তু তাঁর কনশেন্স্ বাধা দিয়ে বললে—'উঁহু, একটু সবুর কর, যদি ঘাড় মটকাবার লক্ষণ দেখ তখন না-হয় রামনাম ক'রো।'

এ'রা একটা পাকুড় গাছের নীচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাদা-গোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল।

তখন সামনের সেই কাল মূর্তিটা নাকী সুরে বললে—'মহেশবাবু, আপনি নাকি ভূত মানেন না?'

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই ব'লে থাকেন—আজ্ঞে হাঁ, মানি বই কি। কিন্তু মহেশ মিত্তির বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন একটা খেয়াল হ'ল, ধাঁ ক'রে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাঁধ খামচে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোন্ ক্লাস?'

ভূত থতমত খেয়ে জবাব দিলে—'সেকেণ্ড ইয়ার সার!'

'রোল নম্বর কত?'

ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে— 'বলি সার?'

হরিনাথের মুখে রাম রাম ভিন্ন কথা নেই। পিছনের দুটো ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল সে টুপ ক'রে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন বেগতিক দেখে সামনের ভূতটি ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারলে।

মহেশ মিত্তির হরিনাথের পিঠে একটা প্রচণ্ড কিল মেরে বললেন—'জোচ্চোর!'

হরিনাথও পাল্টা কিল মেরে বললেন—'আহাম্মক!'

নিজের নিজের পিঠে হাত বুলতে বুলতে দুই বন্ধু বাড়ি-মুখো হলেন। আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল তারা মনে মনে বললে—আজি রজনীতে হয় নি সময়।

পরদিন কলেজে হুলস্থূল বেধে গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনে প্রিনসিপাল ভয়ংকর রাগ ক'রে বললেন— 'অত্যন্ত শেমফুল কাণ্ড। দুজন নামজাদা অধ্যাপক একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাতাহাতি! হরিনাথ তোমার লজ্জা নেই?'

হরিনাথবাবু ঘাড় চুলকে বললেন—'আজ্ঞে আমার উদ্দেশ্যটা ভালই ছিল। মহেশকে রিফর্ম করবার জন্য যদি একটু ইয়ে ক'রেই থাকি তাতে দোষটা কি—হাজার হোক আমার বন্ধু তো?'

মহেশবাবু গর্জন ক'রে বললেন—'কে তোমার বন্ধু?'

প্রিনসিপাল বললেন—'মহেশ তুমি চুপ কর। উদ্দেশ্য যাই হোক, কলেজের ছেলেদের এর ভেতর জড়ানো একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ। হরিনাথ তুমি বাড়ি যাও, তোমায় সাসপেণ্ড করলুম। আর মহেশ তোমাকেও সাবধান ক'রে দিচ্ছি—আমার কলেজে আর ভুতুড়ে তর্ক তুলতে পারবে না।'

মহেশবাবু উত্তর দিলেন—'সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া শক্ত। সকল রকম কুসংস্কার দূর করাই আমার জীবনের ব্রত।'

'তবে তোমাকেও সাসপেণ্ড করলুম।'

অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ ক'রে সমস্ত শুনছিলেন। তাঁরা প্রিনসিপালের হুকুম শুনে কোনও প্রতিবাদ করলেন না, কারণ সকলেই জানতেন যে তাঁদের কর্তার রাগ বেশী দিন থাকে না।

মহেশবাবু তাঁর বাসায় ফিরে এলেন। হরিনাথের ওপর প্রচণ্ড রাগ—হতভাগা একটা গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করতে চায় জুয়োচুরি দ্বারা! সে আবার ফিলসফি পড়ায়! এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশবাবু কখনও পান নি।

মানুষের মন যখন নিদারুণ ধাক্‌কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার জন্য উপায় খোঁজে। কেউ কাঁদে, কেউ তর্জন-গর্জন করে, কেউ কবিতা লেখে। একটা তুচ্ছ কোঁচ-বকের হত্যাকাণ্ড দেখে মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে ঘা লেগেছিল,

তাই প্রকাশ করবার জন্য তিনি হঠাৎ দু-ছত্র শ্লোক রচনা ক'রে ফেলেন—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ ইত্যাদি। তারপর সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখে তাঁর ভাবের বোঝা নামাতে পেরেছিলেন। আমাদের মহেশ মিত্তির চিরকাল নীরস অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা ক'রে এসেছেন, কাব্যের কিছুই জানতেন না। কিন্তু আজ তাঁরও মনে সহসা একটা কবিতার অঙ্কুর গজগজ করতে লাগল। তিনি আর বেগ সামলাতে পারলেন না, কলেজের পোশাক না ছেড়েই বড় একখানা আলজেব্রা খুলে তার প্রথম পাতায় লিখলেন—

হরিনাথ কুণ্ডু,
খাই তার মুণ্ডু।

কবিতাটি লিখে বার বার ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে আদিকবি বাল্মীকির মতন ভাবলেন, হাঁ, উত্তম হয়েছে।

কিন্তু একটা খটকা বাধল। কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডুর মিল আবহমান কাল থেকে চ'লে আসছে, এতে মহেশের কৃতিত্ব কোথায়? কালিদাসই হোন আর রবীন্দ্রনাথই হোন, কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডু মেলাতেই হবে—এ হ'ল প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। মহেশ একটু ভেবে ফের লিখলেন—

কুণ্ডু হরিনাথ,
মুণ্ডু করি পাত।

হাঁ, এইবারে মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে। মহেশের মনটা একটু শান্ত হ'ল। কিন্তু কাব্যসরস্বতী যদি একবার

কাঁধে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান না। মহেশবাবু লিখতে লাগলেন—

হরিনাথ ওরে,
হবি তুই ম'রে
নরকের পোকা
অতিশয় বোকা।

উঁহু, নরকই নেই তার আবার পোকা। মহেশবাবু স্থির করলেন—কাব্যে কুসংস্কার নাম দিয়ে তিনি শীঘ্রই একটা প্রবন্ধ রচনা করবেন, তাতে মাইকেল রবীন্দ্রনাথ কাকেও রেহাই দেবেন না। তারপর তাঁর কবিতার শেষের চার লাইন কেটে দিয়ে ফের লিখলেন—

ওরে হরিনাথ,
তোরে করি কাত,
পিঠে মারি চড়—

এমন সময় মহেশের চাকরটা এসে বললে—'বাবু চা হবে কি দিয়ে? দুধ তো ছিঁড়ে গেছে।'

মহেশবাবু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—'সেলাই ক'রে নে।'

পিঠে মারি চড়,
মুখে গুঁজি খড়।
জেবলে দেশলাই
আগুন লাগাই।

কিন্তু আবার এক আপত্তি। হরিনাথকে পুড়িয়ে ফেললে

জগতের কোনও লাভ হবে না, অনর্থক খানিকটা জান্তব পদার্থ বরবাদ হবে। বরং তার চাইতে—

হরিনাথ ওরে,
পোড়াব না তোরে।
নিয়ে যাব ধাপা
দেব মাটি-চাপা।
সার হয়ে যাবি,
ঢ্যাঁড়স ফলাবি।

মহেশবাবু আরও অনেক লাইন রচনা করেছিলেন, তা আমার মনে নেই। কবিতা লিখে খানিকটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর হৃদয়টা বেশ হালকা হ'ল, তিনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তিন দিন যেতে না যেতে প্রিনসিপাল মহেশ আর হরিনাথকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আবার নিজের নিজের কাজে বাহাল হলেন, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। সহকর্মীরা মিলনের অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। হরিনাথ বরং একটু সন্ধির আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু মহেশ একবারে পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন।

কিছুদিন পরে মহেশবাবুর খেয়াল হ'ল—প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একতরফা বিচার করাটা ন্যায়সংগত নয়, এর

অনুকূল প্রমাণ কে কি দিয়াছেন তাও জানা উচিত। তিনি দেশী বিলিতী বিস্তর বই সংগ্রহ ক'রে পড়তে লাগলেন, কিন্তু তাতে তাঁর অবিশ্বাস আরও প্রবল হ'ল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নেই, কেবল আছে—অমুক ব্যক্তি কি বলেছেন আর কি দেখেছেন। বাঘের অস্তিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই, কারণ জন্তুর বাগানে গেলেই দেখা যায়। ভূত যদি থাকেই, তবে খাঁচায় পুরে দেখা না বাপু। তা নয়, শুধু ধাপ্পাবাজি। প্রেততত্ত্ব চর্চা ক'রে মহেশবাবু বেজায় চ'টে উঠলেন। শেষটায় এমন হ'ল যে ভূতের গুষ্ঠিকে গালাগাল না দিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

প'ড়ে প'ড়ে মহেশের মাথা গরম হয়ে উঠল। রাত্রে ঘুম হয় না, কেবল স্বপ্ন দেখেন ভূতে তাঁকে ভেংচাচ্ছে। এমন স্বপ্ন দেখেন ব'লে নিজের ওপরেও তাঁর রাগ হ'তে লাগল। ডাক্তার বললে—পড়াশুনা বন্ধ করুন, বিশেষ ক'রে ঐ ভুতুড়ে বইগুলা—যা মানেন না তার চর্চা করেন কেন। কিন্তু ঐ সব বই পড়া মহেশের এখন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়লেই রাগ হয়, আর সেই রাগেতেই তাঁর সুখ।

অবশেষে মহেশ মিত্তির কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। দিন দিন শরীর ক্ষয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রোগটা ঠিক নির্ণয় হ'ল না। সহকর্মীরা প্রায়ই এসে তাঁর খবর নিতেন। হরিনাথও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু মহেশ তাঁর মুখদর্শন করলেন না।

সাত-আট মাস কেটে গেল। শীতকাল, রাত দশটা। হরিনাথবাবু শোবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় মহেশের চাকর এসে খবর দিলে যে তার বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, অবস্থা বড় খারাপ। হরিনাথ তখনই হাতিবাগানে মহেশের বাসায় ছুটলেন।

মহেশের আর দেরি নেই, মৃত্যুর ভয়ও নেই। বললেন —'হরিনাথ তোমায় ক্ষমা করলুম। কিন্তু ভেবো না যে আমার মত কিছুমাত্র বদলেছে। এই রইল আমার উইল, তোমাকেই অছি নিযুক্ত করেছি। আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেছি, তার সুদ থেকে প্রতি বৎসর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সে ঐ পুরস্কার পাবে। আর দেখ—খবরদার, শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ ক'রো না। ফুলের মালা চন্দন-কাঠ ঘি এসব দিও না, একদম বাজে খরচ। তবে হাঁ, দু-চার বোতল কেরোসিন ঢালতে পার। দেড় সের গন্ধক আর পাঁচ সের সোরা আনানো আছে, তাও দিতে পার, চটপট কাজ শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, চললুম তা হ'লে।'

রাত প্রায় সাড়ে এগারটা। মহেশের আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় নেই, থাকলেও বোধ হয় তারা আসত না। বড়দিনের বন্ধ, কলেজের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই অন্যত্র গেছেন। হরিনাথ মহা বিপদে পড়লেন। মহেশবাবুর চাকরকে বললেন পাড়ার জনকতক লোক ডেকে আনতে।

অনেকক্ষণ পরে দুজন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন। ঘরে ঢুকলেন না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—'চুপ ক'রে ব'সে আছেন যে বড়? সৎকারের ব্যবস্থা কি করলেন?'

হরিনাথ বললেন—'আমি একলা মানুষ, আপনাদের ওপরেই ভরসা।'

'ওই বেলেল্লা হতভাগার লাস আমরা বইব? ইয়ারকি পেয়েছেন নাকি!' এই কথা ব'লেই তাঁরা স'রে পড়লেন।

হরিনাথের তখন মনে প'ড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে একটা মাটকোঠায় সাইনবোর্ড দেখেছেন—বৈতরণী সমিতি, ভদ্রমহোদয়গণের দিবারাত্র সস্তায় সৎকার। চাকরকে বসিয়ে রেখে তখনই সেই সমিতির খোঁজে গেলেন।

অনেক চেষ্টায় সমিতি থেকে তিন জন লোক যোগাড় হ'ল। পনর টাকা পারিশ্রমিক, আর শীতের ওষুধ বাবদ ন-সিকে। সমস্ত আয়োজন শেষ হ'লে হরিনাথ আর তাঁর তিন সঙ্গী খাট কাঁধে নিয়ে রাত আড়াইটার সময় নিমতলায় রওনা হলেন।

অমাবস্যার রাত্রি, তার ওপর আবার কুয়াশা। হরিনাথের দল কর্নওআলিস স্ট্রীট দিয়ে চললেন। গ্যাসের আলো মিটমিট করছে, পথে জনমানব নেই। কাঁধের বোঝা ক্রমেই ভারী বোধ হ'তে লাগল, হরিনাথ হাঁপিয়ে পড়লেন।

বৈতরণী সমিতির সর্দার ত্রিলোচন পাকড়াশী বুঝিয়ে দিলেন —এমন হয়েই থাকে, মানুষ ম'রে গেলে তার ওপর জননী বসুন্ধরার টান বাড়ে।

হরিনাথ একলা নয়, তাঁর সঙ্গীরা সকলেই সেই শীতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠল। খাট নামিয়ে খানিক জিরিয়ে আবার যাত্রা।

কিন্তু মহেশ মিত্তিরের ভার ক্রমশই বাড়ছে, পা আর এগয় না। পাকড়াশী বললেন—'ঢের ঢের বয়েছি মশায়, কিন্তু এমন জগদ্দল মড়া কখনও কাঁধে করি নি। দেহটা তো শুকনো, লোহা খেতেন বুঝি? পনর টাকায় হবে না মশায়, আরও পাঁচ টাকা চাই।'

হরিনাথ তাতেই রাজী, কিন্তু সকলে এমন কাবু হয়ে পড়েছে যে দু-পা গিয়ে আবার খাট নামাতে হ'ল। হরিনাথ ফুটপাথে এলিয়ে পড়লেন, বৈতরণীর তিন জন হাঁপাতে হাঁপাতে তামাক টানতে লাগল।

ওঠবার উপক্রম করছেন এমন সময় হরিনাথের নজরে পড়ল—কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা আবছায়া তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখলেন—কাল র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটা লোক। লোকটি বললে—'এঃ আপনারা হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি। বলেন তো আমি কাঁধ দিই।'

হরিনাথ ভদ্রতার খাতিরে দু-একবার আপত্তি জানালেন, কিন্তু শেষটায় রাজী হলেন। লোকটি কোন্ জাত তা আর

জিজ্ঞাসা করলেন না, কারণ মহেশ মিত্তির ও-বিষয়ে চিরকাল সমদর্শী, এখন তো কথাই নেই। তা ছাড়া যে লোক উপযাচক হয়ে শ্মশানযাত্রার সঙ্গী হয় সে তো বান্ধব বটেই।

ত্রিলোচন পাকড়াশী বললেন—'কাঁধ দিতে চাও দাও, কিন্তু বখরা পাবে না, তা ব'লে রাখছি।'

আগন্তুক বললে—'বখরা চাই না।'

এবার হরিনাথকে কাঁধ দিতে হ'ল না, তাঁর জায়গায় নতুন লোকটি দাঁড়াল। আগের চেয়ে যাত্রাটা একটু দ্রুত হ'ল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পা চলে না, ফের খাট নামিয়ে বিশ্রাম।

পাকড়াশী বললেন—'কুড়ি টাকার কাজ নয় বাবু, এ হ'ল মোষের গাড়ির বোঝা। আরও পাঁচ টাকা চাই।'

এমন সময় আবার একজন পথিক এসে উপস্থিত—ঠিক প্রথম লোকটির মতন কাল র‍্যাপার গায়ে। এও খাট বইতে প্রস্তুত। হরিনাথ দ্বিরুক্তি না ক'রে তার সাহায্য নিলেন। এবার পাকড়াশী মশায় রেহাই পেলেন।

খাট চলেছে, আর একটু জোরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ক্লান্তি। মহেশের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার দেহে কিছু ঢোকে নি তো? খাট নামিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগল।

কে বলে শহুরে লোক স্বার্থপর? আবার একজন সহায়

এসে হাজির, সেই কাল র‍্যাপার গায়ে। হরিনাথের ভাববার অবসর নেই, বললেন, চল, চল।

আবার যাত্রা, আরও একটু জোরে, তারপর ফের খাট নামাতে হ'ল। এই যে, চতুর্থ বাহক এসে হাজির, সেই কাল র‍্যাপার। এরা কি মহেশকে বইবার জন্যই এই তিন পহর রাতে পথে বেরিয়েছে? হরিনাথের আশ্চর্য হবার শক্তি নেই, বললেন— 'ওঠাও খাট, চল জলদি।'

চারজন অচেনা বাহকের কাঁধে মহেশের খাট চলেছে, পিছনে হরিনাথ আর বৈতরণী সমিতির তিন জন। এইবার গতি বাড়ছে, খাট হনহন ক'রে চলছে। হরিনাথের আর তাঁর সঙ্গীদের ছুটতে হ'ল।

আরে অত তাড়াতাড়ি কেন, একটু আস্তে চল। কেই বা কথা শোনে! ছুট—ছুট। 'আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, থাম থাম, বীড্‌ন স্ট্রীট ছাড়িয়ে গেলে যে! লোকগুলো কি শুনতে পায় না? ওহে পাকড়াশী, থামাও না ওদের।' কোথায় পাকড়াশী? তিনি বিচক্ষণ লোক, ব্যাপারটা বুঝে টাকার মায়া ত্যাগ ক'রে সদলে পালিয়েছেন।

মহেশের খাট তখন তীর বেগে ছুটছে, হরিনাথ পাগলের মতন পিছু পিছু দৌড়চ্ছেন। কর্নওআলিস স্ট্রীট, গোলদিঘি, বউবাজারের মোড়—সব পার হয়ে গেল। কুয়াশা ভেদ ক'রে সামনের সমস্ত পথ ফুটে উঠেছে—এ পথের কি শেষ নেই? রাস্তা কি ওপরে উঠেছে না নীচে নেমেছে? এ কি আলো না

অন্ধকার? দূরে ও কি দেখা যাচ্ছে—সমুদ্রের ঢেউ, না চোখের ভুল?

হরিনাথ ছুটতে ছুটতে নিরন্তর চীৎকার করছেন—'থাম, থাম।' ও কি, খাটের ওপর উঠে বসেছে কে? মহেশ? মহেশই তো। কি ভয়ানক! দাঁড়িয়েছে, ছুটন্ত খাটের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিছনে ফিরে লেকচারের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে কি বলছে?

দূর দূরান্তর থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল—'হরিনাথ—ও হরিনাথ—ওহে হরিনাথ—'

'কি, কি? এই যে আমি।'

'ও হরিনাথ—আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি—'

মহেশের খাট অগোচর হয়ে এল, তখনও তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—'আছে, আছে…'

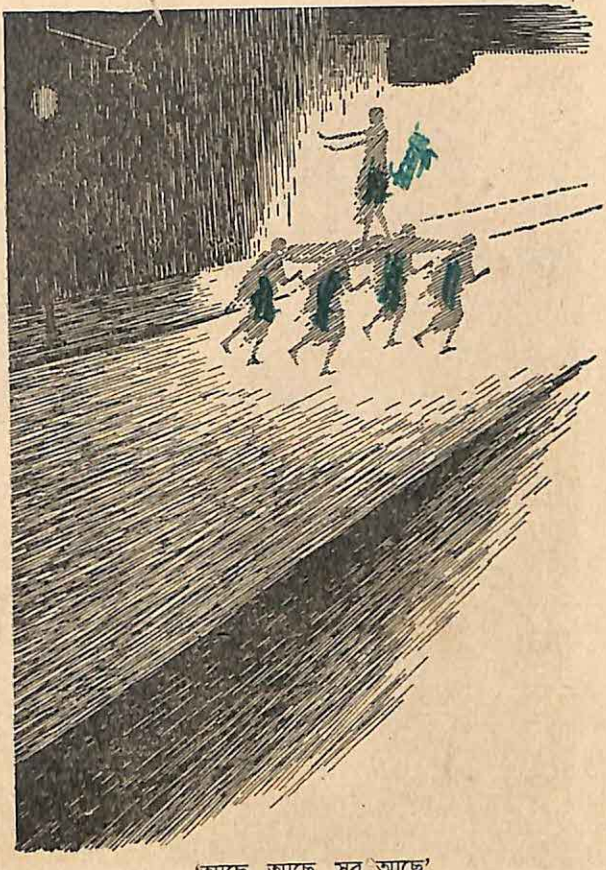
হরিনাথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটের পুলিস তাঁকে দেখতে পেয়ে মাতাল ব'লে চালান দিলে। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়ে বহু কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেন।

বংশলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'গয়ায় পিণ্ড দেওয়া হয়েছিল কি?'

'শুধু গয়ায়! পিণ্ডদাদনখাঁএ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয় নি, পিণ্ড ছিটকে ফিরে এল।'



'কি, কি? এই যে আমি'



'আছে, আছে, সব আছে'

এই নেই " নেই

'তার মানে?'

'মানে—মহেশ পিণ্ডি নিলেন না, কিংবা তাঁকে নিতে দিলে না।'

'আশ্চর্য। মহেশ মিত্তিরের টাকাটা?'

'সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কাজ কিছুই হয় নি, ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোনও ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হোক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শব্দ শুরু হ'ল যে সব্বাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশ-ফাণ্ডের নাম কেউ করে না।'

রাতারাতি

শহরে আবার ছেলেধরার উপদ্রব শুরু হইয়াছে। বিকালে বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় তাহারই কথা হইতেছে।

বংশলোচনের ভাগনে উদয় মহা উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলিতেছিল—'আজকের খবর শুনেছেন? পঞ্চাশটা ছেলে হারিয়েছে। কাল পঁচাত্তরটা। কিন্তু আশ্চর্য এই, যারা নিরুদ্দেশ হচ্ছে তাদের নামধাম কেউ টের পায় না। এদিকে লোকে খেপে উঠেছে, মোটর গাড়ি পোড়াচ্ছে, রাস্তার মানুষকে ধ'রে ধ'রে ঠেঙাচ্ছে, পুলিস কিছুই করতে পারছে না। ওঃ, হুলস্থূল ব্যাপার!'

বংশলোচনবাবু বলিলেন—'কাগজে কি লিখছে?'

তাঁহার শালা নগেন বলিল—'এই শুনুন না, আজকের ধূমকেতু খুব জোর লিখেছে।—আমরা জানিতে চাই দেশের এই অরাজক অবস্থার জন্য দায়ী কে? অজ্ঞ লোকে রটাইতেছে বালি ব্রিজের বনিয়াদ পোক্ত করিবার জন্য দশ হাজার ছেলে পুঁতিবে। বিজ্ঞ লোকে বলিতেছেন ছেলেরা সংসারে বীতরাগ হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেছে। কাহার কথা বিশ্বাস করিব? দেশনেতৃগণ এখন দলাদলি বন্ধ রাখুন, গভর্নমেণ্ট উঠিয়া পড়িয়া লাগুন, আমরা তারস্বরে প্রশ্ন করিতেছি তাহার

উত্তর দিন—কোন্ দুরাত্মা দেশমাতৃকাকে সন্তানহারা করিতেছে?'

বংশলোচনের ছোট ছেলে ঘেণ্টু বলিল—'বাবা, ছেলেধরা বাবা ধরে? বল না বাবা!'

উকিল বিনোদবাবু বলিলেন—'তেমন তেমন বাবা হ'লে ধরে বই কি। কিন্তু তুমি ভেবো না খোকা, আমরা রক্ষা করব।'

বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে মহাশয় নিবিষ্ট হইয়া তামাক খাইতেছিলেন। নগেন তাঁহাকে বলিল—'চাটুজ্যে মশায়, আপনি সাবধানে চলাফেরা করবেন।'

বংশলোচন। উনি তো প্রবীণ লোক, ওঁকে ধরবে কেন?

নগেন। মনেও ভাববেন না তা। চ্যবনপ্রাশ খাইয়ে তরুণ বানাবে, তার পর চালান দেবে।

উদয় সভয়ে বলিল—'তরুণদেরই ধরছে বুঝি?'

চাটুজ্যে হুঁকা রাখিয়া বলিলেন—'উদো, তুই কি রকম লেখাপড়া শিখেছিস দেখি। জোয়ান যুবক আর তরুণ—এদের মধ্যে তফাত কি বল্ তো।'

উদয়। জোয়ান হচ্ছে যার গায়ে খুব জোর। যুবক মানে যুবা, যাকে বলে ইয়ং ম্যান। তরুণ হ'ল গিয়ে মানে অর্থাৎ যাকে বলে—দাঁড়ান, অভিধান দেখে বলছি—

চাটুজ্যে। অভিধানে পাবি না, আজকাল মানে বদলে গেছে। আমি অনেক ভেবে চিন্তে যা বুঝেছি শোন্। যাঁর দাড়ি

গোঁপ দু-ই আছে তিনি হলেন জোয়ান, যেমন রবি ঠাকুর, পি সি রায়। যাঁর দাড়ি নেই শুধুই গোঁপ তিনি যুবক, যেমন আশু মুখুজ্যে, গান্ধীজী। আর যাঁর দাড়িও নেই গোঁপও নেই তিনি তরুণ, যেমন বঙ্কিম চাটুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে আর এই কেদার চাটুজ্যে।

উদয়। আর আমি? নগেন মামা?

চাটুজ্যে। তোরা হলি ওই তিনের বার, যাকে বলে অপোগণ্ড। ধরতে হয় তোদেরই ধরবে।

উদয় চিন্তা করিয়া বলিল—'আমি দাড়ি রাখতুম, কিন্তু বউ বলে—'

নগেন। খবরদার উদো, ফের যদি বউএর কথা পাড়বি তো কান ম'লে দেব।

চাকর আসিয়া বংশলোচনের হাতে একটা টেলিগ্রাম দিয়া গেল। বংশলোচন দেখিয়া বলিলেন—'এ যে চাটুজ্যে মশায়ের নামে তার!'

চাটুজ্যে। আমাকে তার করলে কে? দেখ তো প'ড়ে কি ব্যাপার।

বংশলোচন। কার্তিক মিসিং—

উদয়। অ্যাঁ, বলেন কি?

বংশলোচন। চরণ ঘোষ টেলিগ্রাম করছেন মজিলপুর থেকে—কাত্তিককে পাওয়া যাচ্ছে না, পুলিসে খবর দিতে বলছেন। পাঁচটার ট্রেনে চরণবাবু নিজেও আসছেন। ছ-টা

তো বেজে গেছে, তা হ'লে এসে পড়লেন ব'লে। ওঁর কাছে সব শুনে পুলিসে খবর দেওয়া যাবে। কাত্তিকটি কে?

চাটুজ্যে। চরণের বড় ছেলে, এখানে হস্টেলে থেকে পড়ে, প্রতি শনিবারে দেশে যায়। এখন তো কলেজ বন্ধ, মজিলপুরেই তার থাকবার কথা।

নগেন। কাত্তিককে চুরি করবে এমন ছেলেধরা জন্মায় নি। ও সব বাজে খবর।

চাটুজ্যে। চিনিস নাকি কাত্তিককে?

নগেন। বিলক্ষণ চিনি, আমার সেজো শালা বাঁটলোর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। বিখ্যাত ছোকরা, শিশুকাল থেকেই বেশ চৌকস। যখন দশ বৎসর বয়েস তখন সে তার বান্ধবীদের ব'লত—মেয়েগুনো আবার মানুষ! মাথায় একগাদা চুল, আবার ফিতে বাঁধা, আবার শুধু শুধু দাঁত বার ক'রে হাসে! মারতে হয় এক ঘুঁষি! তার পর চোদ্দ বছর বয়সে সে তার প্রাণের বন্ধু বাঁটলোকে লিখলে—নারীর প্রেম? কখনই নয়। ভাই বাঁটলু, এ জগতে কারও থাকবার দরকার নেই, শুধু তুমি আর আমি। কিন্তু দু বছর যেতে না যেতে তার যৌবন-নিকুঞ্জের পাখি কা কা ক'রে উঠল। কাত্তিক তার কবিতার খাতায় লিখলে—নারী, বুঝিতে না পারি কবে, একান্ত আমারি তুমি হবে, কত দিনে ওগো কত দিনে, পারছি নে আর পারছি নে।

বংশলোচন। এ সব তো ভাল কথা নয়। চাটুজ্যে মশায়, চরণবাবু ছেলের বিয়ে দেন না কেন?

চাটুজ্যে। বলেছি তো অনেকবার, কিন্তু চরণ বড় একগুঁয়ে। অন্য বিষয়ে সেকেলে হ'লেও ছেলের বিয়ে দেবার বেলায় সে একেলে। বলে, লেখাপড়া সাঙ্গ করুক রোজগার করুক, তার পর বিয়ে। তবে কাত্তিকের জন্যে কনে ঠিক করাই আছে, চরণের বাল্যবন্ধু রাখাল সিংগির মেয়ে। তের-চোদ্দ বছর আগে দুই বন্ধুতে কথা স্থির হয়। তার পর রাখালবাবু মারা গেলেন, কিছুকাল পরে তাঁর স্ত্রীও গত হলেন, মেয়েটার ভার নিলে তার মামা। মামা শুনেছি কোথাকার জজ, সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন।

নগেন। রাখাল সিংগির মেয়ে তো? কাত্তিক কখ্খনো তাকে বিয়ে করবে না, সে মেয়ে নাকি জংলী ভূত।

এমন সময় চরণ ঘোষ আসিয়া পোঁছিলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মাথায় একটি ছোট টিকি, কাঁচা-পাকা ছাঁটা গোঁপ, গলায় কণ্ঠি, এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে ছোট একটি ব্যাগ। চরণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—'পাজী হতভাগা!'

চাটুজ্যে। তা হ'লে ছেলের খোঁজ পেয়েছ? দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।

চরণ। বকাটে মিথ্যুক ছুঁচো!

চাটুজ্যে। বিপত্তৌ মধুসূদনম্, ভগবান রক্ষা করেছেন।

চরণ। ব্যাটা আমার লেখাপড়া শিখছেন!

বংশলোচন। চরণবাবু, একটু শান্ত হোন।

চাটুজ্যে। আরে রাগ পরে ক'রো এখন। খবর কি আগে বল।

চরণ। খবর আমার মাথা। এখন কলেজ বন্ধ, গুড ফ্রাইডের ছুটি, কাত্তিক ক-দিন আমার কাছেই ছিল, আমরাও নিশ্চিন্ত, মজিলপুরে তো আর ছেলেধরার উপদ্রব নেই। কাল সকালে বললে—ফিলসফির খান-দুই বই বাঁটলোর কাছে রয়েছে, কলকাতায় গিয়ে নিয়ে আসি। আমি বললুম—যাবি আর আসবি, দুপুরের গাড়িতে ফিরে আসা চাই। বেলা শেষ হয়ে গেল কিন্তু কাত্তিক ফিরল না, রাত্রি কাবার হ'ল তবু ছেলের খবর নেই। তার মা কান্নাকাটি শুরু করলেন, কারণ পরশু নাকি কলকাতায় তেষট্টিটা ছেলে চুরি গেছে। অগত্যা তোমায় একটা জরুরী তার ক'রে দিলুম, তার পর বিকেলের গাড়িতে চ'লে এলুম। প্রথমেই গেলুম বাঁটলোদের ওখানে। তার ছোট ভাই শাঁটলো বললে—বাঁটলো আর কাত্তিক কজন বন্ধুর সঙ্গে ওভারটুন হলে বক্তৃতা শুনতে গেছে। কিন্তু বাঁটলোর বোন বললে—শোনেন কেন, সব মিথ্যে কথা, বাবুরা অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলে খেতে গেছেন, তার পর যাবেন সিনেমায়, তার পর অনেক রাত্রে ফিরে এসে দরজায় ধাক্‌কা লাগাবেন। হতভাগা, এই তোর ফিলসফির বই আনতে যাওয়া! এখন ছোঁড়াটাকে খুঁজে বার করি কি ক'রে?

বিনোদ। খবর যখন পেয়েছেন তখন আর খোঁজবার

দরকার কি। ছেলে কলকাতায় এসেছে একটু ফুর্তি করতে, যথাকালে বাড়ি ফিরবে।

চরণ। ফুর্তি বার ক'রব! হতভাগা এখানে এসেছে ইয়ারকি দিতে, আর আমরা ভেবে মরছি। কান ধ'রে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাব। চাটুজ্যে, চল।

চাটুজ্যে। যাব কোথায়?

নগেন। ধর্মতলার মোড়ে অ্যাংলো-মোগলাই। ট্যাকসিতে চ'ড়ে সোজা চ'লে যান দশ মিনিটে পোঁছবেন।

চরণ ঘোষ ও চাটুজ্যে মহাশয় বাহির হইলেন।

অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলটি ছোট কিন্তু সুবিখ্যাত। আলোয় গন্ধে কলরবে ভরপুর। খোপে খোপে নানা লোক খাইতেছে, কেহ একলা, কেহ সদলে। দরজার পাশে একটা ডেস্কের সামনে ম্যানেজার কখনও বসিয়া কখনও দাঁড়াইয়া চারিদিকে নজর রাখিতেছে এবং মাঝে মাঝে হাঁকিতেছে—'তিন নম্বরে এক প্লেট কোর্মা, ছ নম্বরে দুটো চা চারটে কাটলেট শিগ্‌গির, পাঁচ নম্বরে আরো দুটো ডেভিল' ইত্যাদি।

চরণ ঘোষ ও চাটুজ্যে প্রবেশ করিলেন। চাটুজ্যে চুপি চুপি বলিলেন—'আস্তে, চেঁচিও না—ঐ যে বাবাজীরা ঐখানে খাচ্ছেন।'

চরণ ঘোষ নাক টিপিয়া বলিলেন—'রাঁধামাধব, এমন জাঁয়গায় ভ'দ্রলোক আসে! য'তসব রাক্ষস জুটে অ'খাদ্য খাচ্ছে।'

চাটুজ্যে। আরে চুপ চুপ। বেচারাদের অপরাধ নেই, হাজার বছর ধ'রে শুনে এসেছে—এটা খেও না, ওটা খেও না। এখন যখন ভগবান সুবুদ্ধি আর সুবিধে দিয়েছেন তখন জন্মজন্মান্তরের অতৃপ্তি চটপট মিটিয়ে নিতে হবে। আহা, এদের ভোজন সার্থক হোক। এই যে এরা বাঘের মতন গবগব ক'রে খাচ্ছে সেই সঙ্গে যেন বাঘের সদ্‌গুণও কিছু পায়। এদের গায়ে গত্তি লাগুক, মনে সাহস হোক, খোঁচা দিলে যেন খ্যাঁক ক'রে নির্ভয়ে তেড়ে যেতে পারে।

ম্যানেজার বলিল—'আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ঐ দু নম্বরে বসুন দয়া ক'রে।'

চাটুজ্যে ঠোঁটে আঙুল দিয়া বলিলেন—'চুপ, আস্তে আস্তে।'

ম্যানেজার সহাস্যে বলিল—'লজ্জা কি মোসাই, এখানে কত বুড়ো থুত্থুড়ে জজ মেজিস্টর মহামহোপাধ্যায় পায়ের ধুলো দেন। আপনারা বরঞ্চ পর্দাটা টেনে দিয়ে বসুন। কি খাবেন মোসাই?'

চাটুজ্যে। অ, এখানে বুঝি অম্‌নি বসা যায় না?

ম্যানেজার। হেঁ হেঁ। খান-দুই কাটলেট দেব কি?

অ্যাংলো-মোগলাইএর নবতম অবদান—মুরগির ফ্রেঞ্চ মালপো, কচি ভাইটো-পাঁটার ইষ্টু—দেখুন না একটু ট্রাই ক'রে।

চাটুজ্যে। না বাপু, অবদান খাবার আর বয়েস নেই।

ম্যানেজার চরণ ঘোষের টিকি আর কণ্ঠি লক্ষ্য করিয়া বলিল—ঠাকুরমোসাই, আপনাকে খান-দুই ডবল ডিমের রাধা-বল্লভি দেবে কি?

চরণ। দেবে আমার মাথা। ডাক ঐ রাক্ষসটাকে।

ম্যানেজার। রাক্ষস-টাক্ষস এখানে পাবেন না মোসাই, সব জেণ্টেলম্যান।

চাটুজ্যে। আরে কর কি চরণ, চুপ চুপ। নিজের ছেলেবেলার কীর্তিকলাপ সব ভুলে গেলে? সেই যে কাবাবের ঠোঙা নিয়ে গাব গাছে চ'ড়ে খেতে আর কোকিল ডাকতে তা কি মনে নেই? এখন নাহয় গোঁসাই মহারাজের কাছে মন্তর নিয়ে কণ্ঠি ধারণ করেছ, মাংসের গন্ধে কানে আঙুল দাও। ছেলের খাওয়া শেষ হোক, তার পর একটু আধটু ধমক দিও। আপাতত এদিকে চুপটি ক'রে ব'স, একটু শরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা হও, আর শ্রীমানরা কি আলোচনা করছেন তাই আড়ি পেতে শোন, বিস্তর জ্ঞান লাভ করবে। যদি কিছু অশ্রাব্য অলৌকিক কথা কর্ণগোচর হয় তখন নাহয় গলা খাঁকার দিয়ে আত্মপ্রকাশ করা যাবে। ওহে ম্যানেজার, দুটো ঘোল দাও তো।

কার্তিক এবং তাহার তিন বন্ধু বাঁটলো গোপাল ও ঘনেন

কিছু দূরে একটা পর্দার আড়ালে বসিয়া আছে। তাহাদের খাওয়া শেষ হইয়াছে, এখন তর্ক চলিতেছে।

গোপাল। আইডিয়াল একটা চাই বই কি, নয়তো লাইফটা কমনপ্লেস মনোটোনস হয়ে পড়ে। আইডিয়াল হচ্ছে মাইণ্ডের জুস, তাতেই জীবন সরস থাকে।

ঘনেন। মানলুম না। আইডিয়াল মানুষকে করে স্লেভ টু অ্যান আইডিয়া। আমি চাই ভ্যারাইটি, নো কমিটমেণ্ট। লোথারিওর সেই লাইনটা কি রে?—টু পিক্ অ্যাণ্ড্ চুজ, প্লে ফাস্ট্ অ্যাণ্ড লুজ—তার পর কি যেন। বাঁটলো, তোর আইডিয়াল আছে নাকি?

বাঁটলো। রামো, কস্মিন্ কালে নেই।

চরণ ঘোষ চুপি চুপি বলিলেন—'এ সব কী বলছে হে চাটুজ্যে? কিছু বুঝতে পারছি না।

চাটুজ্যে। চুপ চুপ।

কার্তিক টেবিল চাপড়াইয়া বলিল—'আইডিয়াল টাইডিয়াল বুঝি না। আমি চাই বাস্তবের একটা সিন্থেসিস—এমন নারী, যে বল্লরী বাঁড়ুজ্যের মতন রূপসী, মিসেস চৌবের মতন সাহসী, জিগীষা দেবীর মতন লেখিকা, মেজদির ননদের মতন রসিকা, লোটি রায়ের মতন গাইয়ে, ফাখ্তা খাঁএর মতন নাচিয়ে।

চাটুজ্যে বলিলেন—'ব্বাস রে! এমন তিলোত্তমা আমাদের চোদ্দ পুরুষ কখন দেখে নি। চরণ, আর কথাটি নয়,

বাবাজীকে এই অঘ্রান মাসেই ঝুলিয়ে দাও, নইলে বেচারা বাড়ি-বাড়ি হ্যাংলা দিষ্টি দিয়ে বেড়াবে।'

চরণ ঘোষ লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—'দাঁড়াও, হ্যাংলাপনা ঘুচাচ্ছি। এই কাত্তিকে, হতভাগা ইষ্টুপিড ছুঁচো, কি কচ্ছিস এখানে? ছেলে আমার লেখাপড়া শিখছেন! অধঃপাতে যাচ্ছেন! যত সব বকাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে—'

ঘনেন। খবরদার মশায়, মুখ সামলে কথা কইবেন।

চরণ। ছুঁচোটাকে পই পই ক'রে বললুম—যাবি আর আসবি। সন্ধ্যে হয়ে গেল, ছেলের দেখা নেই। রাত্তির কাবার হ'ল, ছেলে আর আসে না। ছেলেধরার খপ্পরেই প'ড়ল, না মোটর চাপা প'ড়ল, না পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেল—কিছুই জানি না। বাড়ির সবাই ভেবে অস্থির, গর্ভধারিণী কেঁদে কেটে শয্যাশায়ী, আর ছেলে আমার হোটেলে ব'সে ইয়ারকি দিচ্ছেন! হতভাগা ছুঁচো ইষ্টুপিড। এই তোদের ইউনিভার্সিটির শিক্ষে? কি হয় সেখানে? যত সব জোচ্চোর মিলে ছেলেদের মাথা খায়। আর অধঃপাতের আড্ডা হয়েছে এই হোটেল, যত বেহায়া ছেলে বুড়ো জুটে গোগ্রাসে গোস্ত গিলছে। এই বাঁটলোটা হচ্ছে দলের সদ্দার বিশ্ববকাট, ওই গোপ্‌লাটা হচ্ছে জ্যাঠার চূড়ামণি, আর এই ঘনাটা একটা আস্ত বাঁদর।

কার্তিক ঘাড় হেঁট করিয়া গালাগালি হজম করিতে

লাগিল, কিন্তু বন্ধুরা রুখিয়া উঠিল। হোটেলের ম্যানেজার আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

বাঁটলো ছেলেটি অতি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী। সে খুব মোলায়েম করিয়া বলিল—'দেখুন চরণবাবু, নিজের ছেলেকে আপনি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু আমরা কি করি না-করি আপনার পিতার তাতে কি?'

ম্যানেজার বলিল—'জানেন, আপনাকে পুলিসে দিতে পারি?'

চরণ ঘোষ ভেংচাইয়া বলিলেন—'দাও না দেখি!'

ম্যানেজার। জানেন, এটা হচ্ছে অ্যাংলো-মোগলাই কেফ?

বাঁটলো ভুল উচ্চারণ বরদাস্ত করিতে পারে না। বলিল —'কেফ নয়, কাফে।'

ম্যানেজার। ওই হ'ল। জানেন, এটা হেঁজিপেঁজি জায়গা নয়, এটা একটা রেস্‌পেক্‌টেবেল রেষ্টাউরেণ্ট?

বাঁটলো। রেস্তোরাঁ।

ম্যানেজার। এক-ই কথা। জানেন, এটা হচ্ছে শিক্ষিত লোকের রেণ্ডেজভোঁশ?

বাঁটলো। রাঁদেভূ।

বার বার বাধা পাইয়া ম্যানেজার চটিয়া উঠিল। বলিল— 'আরে থাম ডেঁপো ছোকরা। ডেভিল মামলেট কোপ্তা কোর্মা দেরাই বেচে বুড়িয়ে গেলুম, এখন ইনি এলেন উরুশ্চারন শেখাতে!'

বাঁটলো গর্জন করিয়া বলিল—'খদ্দেরকে অপমান? টেক কেয়ার, তোমার হোটেল বয়কট ক'রব, কেবল কুকুরের ঠ্যাং আর সাপের চর্বি চালাচ্ছ!'

ঘরের এক কোণে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। ইনি একজন নীরব কর্মী, দুই প্লেট কোর্মা চুপচাপ শেষ করিয়া এখন রাই-সরিষা ও নেবুর রস দিয়া টোমাটো খাইতেছিলেন। বাঁটলোর কথায় চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—'কী ভয়ানক, সেইজন্যই তো আমি ওসব খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, কেবল জোচ্চুরি, ভাইটামিনের নামগন্ধ নেই।'

হোটেলের ভোক্তার দল আতঙ্কে চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনেকে খাওয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। কেহ বলিল—'অ্যাঁ, কুকুরের ঠ্যাং!' কেহ বলিল—'সর্বনাশ, ভাইটামিন নেই!' ম্যানেজার ব্যস্ত হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিল—'বসুন মোসাই বসুন, ওসব মিথ্যে কথায় কান দেবেন না—আমার কি ধর্মভয় নেই!'

চাটুজ্যে মহাশয় উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন—'মহাশয়রা যদি অনুমতি দেন তো আমি ভাইটামিন সম্বন্ধে দু-চারটে কথা নিবেদন করি।'

কয়েকজন প্রবীণ ভদ্রলোক চোপ চোপ করিয়া ধমক দিয়া গণ্ডগোল থামাইয়া দিলেন। তাহার পর চাটুজ্যে মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'হাঁ, তার পর মশায়, ভাইটামিনের কথা কি বলছিলেন?'

চাটুজ্যে বলিতে লাগিলেন—'বাল্যে দুগ্ধ, যৌবনে লুচি-পাঁঠা, বার্ধক্যে একটু নিমঝোল আর প্রচুর হরিনাম—এই হ'ল আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত পথ্য। কিন্তু অ্যাদ্দিনে আমরা জানতে পেরেছি যে ওসব কেবল উদরপূরণের উপাদান মাত্র, ভাইটামিনই হচ্ছে আসল জিনিস, ভবনদীতে ভাসবার একমাত্র ভেলা, শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই। অতএব ভাইটামিন যদি চান তো কাঁটাল খান।'

টোমাটো-ভোজী বাবুটি বলিলেন—'কাঁটাল?'

চাটুজ্যে। আজ্ঞে হাঁ, কাঁটাল। কবি লিখেছেন—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি, মরি হায় হায় রে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেন নাকো মশায়। এই ধরুন হিমালয় পর্ব্বত, যার জোড়া দুনিয়ায় নেই। তার পর ধরুন রয়াল বেঙ্গল টাইগার—কে লড়বে তার সঙ্গে—সিংহ? সাধ্য কি। তার পর ধরুন কাঁটাল।

টোমাটো-ভোজী। কাঁটাল কি একটা ফল হ'ল মশায়?

চাটুজ্যে। আজ্ঞে হাঁ, বটানি প'ড়ে দেখবেন। ফলের রাজা হচ্ছে কাঁটাল, দু-মন পর্যন্ত ওজন হয়, আবার কাঁটালের রাজা ওতরপাড়ার বঞ্জুলবাবুদের গাছের রসখাজা। এক-একটি কোয়া এক-এক পো, কাঁচা সোনার বর্ণ, ভাইটামিনে টইটম্বুর। গালে দিয়ে বার-পাঁচেক এদিক ওদিক চালিয়ে রস অনুভব করুন, তার পর চক্ষু বুজে একটু চাপ দিন, অবলীলাক্রমে

গন্তব্য স্থানে পেঁ'ছে যাবে। কোথায় লাগে আপনাদের কালিয়া কোপ্তা কোর্মা।

টোমাটো-ভোজী। কোন্ ক্লাসের ভাইটামিন মশায়, এ বি সি না ডি?

চাটুজ্যে। এ-বি-সি-ডি, বি-এল-এ-ব্লে, স্লাই ফক্স্ মেট্ এ হেন্—যা বলেন, ডাক্তারী শাস্ত্রে কোনও বারণ নেই। হেন বস্তু নেই যা কাটালে পাবেন না। গঁুড়ি চিরুন, তক্তা হবে, হোগ্নি কাঠ তার কাছে তুচ্ছ। পাতা পাকিয়ে নিন, হুঁকোয় পরাবার উত্তম নল হবে। আর ফলের তো কথাই নেই। কোলে তুলে নিয়ে বাজান, পাখওয়াজের কাজ করবে। কাঁচার কালিয়া খান, যেন পাঁটা। বিচি পুড়িয়ে খান, যেন কাবুলী মেওয়া। পাকা কোয়ার রস গ্রহণ ক'রে ছিবড়েটা চরকায় চড়িয়ে সুতো কাটুন, বেরবে সিল্ক।

টোমাটো-ভোজী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—'ননসেন্স্।'

চাটুজ্যে। বিশ্বাস হ'ল না বুঝি? তবে মরুন ঐ কাঁচা টোমাটো খেয়ে। আমরা চললুম, নমস্কার। ওঠ হে, চরণ।

ম্যানেজার। ও মোসাই, দুটো ঘোলের দাম দিলেন না?

চাটুজ্যে। আরে মোলো, আবার দাম চায়? এত বড় একটা কুরুক্ষেত্র থামিয়ে দিলুম সেটা বুঝি কিছু নয়? আচ্ছা বাবা, নাও এই সিকি।

চাটুজ্যে মহাশয় চরণ ঘোষকে একটু আড়ালে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—'ছেলেকে ধমক তো ঢের দিয়েছ, এইবার

মিষ্টি কথায় শান্ত ক'রে ডেকে নিয়ে যাও। বাবা কাত্তিক, এস তো এদিকে একবার।'

চরণ ঘোষ বলিলেন—'শোন্ কাত্তিক, এই অঘ্রান মাসে তোর বিয়ে দেব। সেই রাখাল সিংগির মেয়ে নেড়ী, ছোটবেলায় তাকে দেখেছিলি, মনে আছে তো?'

কার্তিক মুখ ভার করিয়া বলিল—'নেড়ী-টেড়ীকে আমি বিয়ে ক'রব না।'

চরণ ঘোষ আবার খেপিয়া উঠিয়া বলিলেন—'করবি না কি রকম? তোর ঘাড় ধ'রে বিয়ে দেব, অবাধ্য ইষ্টুপিড!'

চাটুজ্যে। আ হা হা, কর কি চরণ, তোমার কিছু আক্কেল নেই? এই কি বিয়ের কথা বলবার সময়, না জায়গা? যাও, তুমি আর মিছে দেরি ক'রো না, ন-টার ট্রেন এখনও পাবে। কাত্তিক আজ বাঁটলোদের বাড়িতেই থাকবে। বাবা কাত্তিক, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।

চরণ ঘোষ গজগজ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। কার্তিক ও তাহার তিন বন্ধুর সঙ্গে চাটুজ্যে মহাশয় রাস্তায় আসিলেন।

ঘনেন বলিল—‘এ অপমান কখনই সহ্য করা যায় না, আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি? কার্ত্তিক, তোর বাপকে এক্ষুনি উকিলের চিঠি দে, পাঁচ-শ টাকার ড্যামেজ। মকদ্দমায় আমরা সাক্ষী হব।’

গোপাল। বাপের নামে নালিশ দেখায় খারাপ, হাজার হ’ক বাপ তো বটে। বরং খবরের কাগজে ছাপিয়ে দে, সমস্ত ছেলের দল খেপে উঠবে, বাছাধন টের পাবেন।

ঘনেন। উঁহু, তার চেয়ে জিগীষা দেবীর কাছে চল্, তাঁকে ব’লে ক’য়ে আমরা একটা আশ্রম খুলব। কাগজে ছাপাব —এস কে কোথায় আছ বাংলার ছেলেরা, নির্যাতিত উৎপীড়িত অসহায় বুভুক্ষু—

বাঁটলো। ঐ সঙ্গে একটা মেয়েদের বিভাগও খোলা উচিত; কি বলিস কার্ত্তিক?

কার্তিক করুণ স্বরে বলিল—‘বাঁটলো, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের দাম কত রে?’

বাঁটলো। বিস্তর দাম, তার চেয়ে কেরাসিন তেল ঢের সস্তা, দশ পয়সাতেই কাজ সাবাড়।

কার্তিক। কিন্তু বড্ড জ্বালা করবে যে?

বাঁটলো। সে কতক্ষণ? একবার মরতে পারলে মোটেই টের পাবি না।

চাটুজ্যে মহাশয় কার্তিকের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন

—'ছি বাবা কার্ত্তিক, দুঃখু ক'রো না। একে বাপ, তায় বয়সে বড়, বললেই বা একটু কড়া কথা। বাপের সুপুত্তুর হ'লে সব দেবতা খুশী হন। এই দেখ, রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞায় বনে গিয়েছিলেন।'

ঘনেন। জব্দও হয়েছিলেন তেম্‌নি। মাথায় জটা, গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, চোদ্দ বছর ভ্যাগাবন্ড্, বউ গেল চুরি। চল্‌রে কার্ত্তিক, আমরা একবার জিগীষা দেবীর বাড়ি গিয়ে তাঁর বাণী নিয়ে আসি।

চাটুজ্যে। এত রাত্রে কেন আর তাঁকে বিরক্ত করা, তার চেয়ে এখন নিজের নিজের বাড়ি গিয়ে ঘুমও গে। বাণী নিতে হয় কাল নিও।

ঘনেন। কোথায় রাত, এই তো সবে সাড়ে আটটা। আর করলাবাগান ফার্স্ট লেন তো পাশেই।

চাটুজ্যে। আচ্ছা চল বাবা। বুড়োদের রাজত্ব শেষ হয়েছে, এখন ছোকরাদের পিছু পিছু দৌড়নোই বুদ্ধিমানের কাজ।

ঘনেন। আপনি আবার কি করতে যাবেন?

বাঁটলো। চলুন না উনিও, এক জন মুরুব্বী লোক ডেপুটেশনে থাকা ভাল।

জিগীষা দেবীর বসিবার ঘরটি ছোট। মাঝে একটি টেবিল, তাহার পাশে গোটা কয়েক চেয়ার এবং একটা বেঞ্চ। ছেলেরা এবং চাটুজ্যে মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিলে নাকে ঝুমকো পরা একজন নেপালী দাসী তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

বাঁটলো বলিল—'চাটুজ্যে মশায়, আপনি হচ্ছেন আমাদের দলের সর্দার, দিন আপনার কার্ড পাঠিয়ে।'

চাটুজ্যে। কার্ড-ফার্ড আমার কোনও কালে নেই। ওগো ঝি, মাইজীকে গিয়ে খবর দাও কেদার চাটুজ্যে আর চার জন ছোকরা মোলাকাত করনে মাংতা।

ঘনেন। ছোকরা নয়, বলুন তরুণ।

চাটুজ্যে। হাঁ হাঁ, বোলো চারঠো তরুণ আর একঠো বুড্‌ঢা মাইজীর সাথ দেখা করেগা।

দাসী চোখ কুঁচকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'মেম-সাবকা সাথ?'

চাটুজ্যে। হাঁরে বাপু, জিঘাংসা দেবী।

ঘনেন ধমকাইয়া বলিল—'জিগীষা দেবী। চাটুজ্যে মশায়, আপনার ভীমরতি ধরেছে, ভদ্রমহিলার সামনে অসভ্যতা করবেন দেখছি।'

চাটুজ্যে। দেখ্‌ ঘনা, তুই আর আমার কাছে সভ্যতার বড়াই করিস না। কটা মহিলা দেখেছিস তুই? জানিস, আমার তিন খুড়শাশুড়ী, চার শালাজ, সাত শালী আর গিন্নী

তো আছেনই, এই চল্লিশ বৎসর তাঁদের সঙ্গে কারবার ক'রে আসছি ?

দাসী খবর দিতে গেল। বাঁটলো বলিল—'চাটুজ্যে মশায়, আপনি আমাদের ডেপুটেশনের মুখপাত্র, আমাদের বক্তব্যটা আপনিই বেশ গুছিয়ে বলবেন। ঘাবড়ে যাবেন না তো ?'

চাটুজ্যে। ঘাবড়াবার ছেলে কেদার চাটুজ্যে নয়।

জিগীষা দেবী ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাশভারি মহিলা, দশাসই চেহারা, পাউডারের প্রলেপ ভেদ করিয়া সুগোল মুখের নিবিড় শ্যামকান্তি উঁকি মারিতেছে। কালিদাস যদি দেখিতেন তো লিখিতেন—খড়িপড়া ছাঁচি কুমড়া ইব।

জিগীষা দেবী বলিলেন—'আমাকে এখনি একটা কমিটি-মিটিংএ যেতে হবে, আপনারা একটু তাড়াতাড়ি বক্তব্য শেষ করলে বাধিত হব।'

বাঁটলো। বলুন চাটুজ্যে মশায়।

চাটুজ্যে মহাশয় গলা সাফ করিয়া আরম্ভ করিলেন—'মা-লক্ষ্মী, এই যে দেখছেন চার জন ছোকরা, এরা হচ্ছে চারটি তরুণ। এটির নাম কাত্তিক, হীরের টুকরো ছেলে। এর বাপ চরণ ঘোষের হচ্ছে পিত্তির ধাত, তাই মেজাজটা একটু তিরিক্ষি। দু-সন্ধ্যে ত্রিফলার জল খায়, কিন্তু কিছুই হয় না। চরণ ঘোষ কাত্তিককে বলেছে ছুঁচো, তাতে এ'রা—'

ঘনেন তাহার নোটবুক দেখিয়া বলিল—'তিন বার ছুঁচো বলেছে।'

চাটুজ্যে। ঠিক, তিন বারই ছুঁচো বলেছে বটে। তাতে এই বাবাজীরা সকলেই বড় মর্মাহত হয়েছেন। আমরা ছেলেবেলায় বাপ-জ্যাঠার গালাগাল বিস্তর খেয়েছি, সোনা-পারা মুখ ক'রে সমস্ত সয়েছি। কিন্তু সে দিন আর নেই মশায়। তখন এই কলকাতায় ঘোড়ার ট্রাম চ'লত, ছেলেরা গোঁপ রাখত, কোটের ওপর উড়ুনি ওড়াত, মেয়েরা নোলক প'রত আর নাইবার ঘরে লুকিয়ে গান গাইত, গবরমেণ্টকে লোকে তখন ব'লত সদাশয় সরকার বাহাদুর। যাক সে কথা। এখন আমি বলি কি—বাপ যদি ছেলেকে ছুঁচো ব'লেই থাকে তাতে ক্ষতিটা কি? ছুঁচো ভগবানের সৃষ্ট জীব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। ছুঁচো তুচ্ছ প্রাণী নয়, ইঁদুরের চাইতে তার স্বভাব ভাল, মুখশ্রী ভাল, বুদ্ধিও বেশী। ইঁদুর সম্বন্ধে কবি বলেছেন—কাঠ কাটে বস্ত্র কাটে কাটে সমুদয়, কিন্তু ছুঁচোর এ বদনাম কেউ দিতে পারবে না। কি বলেন মা-লক্ষ্মী?

জিগীষা দেবী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'তরুণের দলে আপনি কেন?'

চাটুজ্যে মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন—'সে একটা সমস্যা বটে, কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন, আমি একজন প্রবীণ তরুণ।'

বাঁটলো। ওঁর বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু মনটি একদম কাঁচা।

জিগীষা দেবী কিন্তু খুশী হইলেন না। চাটুজ্যে মহাশয় বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্য বলিলেন—'কি রকম জানেন? এই গুজরাটী ডাব আর কি, ওপরটা ঝুনো, ভেতরটা নেয়াপাতি।'

ঘনেন তখন চটিয়া আগুন হইয়াছে। ধমকাইয়া বলিল— 'চুপ করুন চাটুজ্যে মশায়, কেবল আবোল-তাবোল বকছেন। আমাকে বলতে দিন।—দেখুন, আমরা বড়ই অপমানিত নির্যাতিত হয়েছি, একেবারে পাব্লিক হোটেলে দু-শ লোকের সামনে। কেন? যেহেতু আমরা পরাধীন, অভিভাবকের অন্নদাস। এই অবস্থা আর সহ্য হয় না, নিজেদের একটা স্বাধীন আশ্রম বানাতে চাই। পিঁজরে-ভাঙা চন্দনা চায় পাখনা মেলে বাঁচতে রে, অরুণ-রাঙা মুক্তাকাশের তক্তাপোশে নাচতে রে। আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন তবে অনায়াসে একটা আশ্রম গ'ড়ে উঠবে। এখন এ সম্বন্ধে একটি বাণী আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি।'

জিগীষা দেবী কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, তাহার পর শিস দিয়া ডাকিলেন—'সুষ্, সুষ্—'

একটি ছোট্ট প্রাণী গুটগুট করিয়া ঘরে আসিল। কুত্তা নয়। ইনি সুষেণবাবু, জিগীষা দেবীর স্বামী। রোগা, বেঁটে, চোখে চশমা, মাথায় টাক, কিন্তু গোঁপ জোড়াটি বেশ বড় এবং মোম দিয়া পাকানো। সতী সাধ্বী যেমন সর্বহারা হইয়াও এয়োতের লক্ষণ শাঁখা-জোড়াটি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে, বেচারা

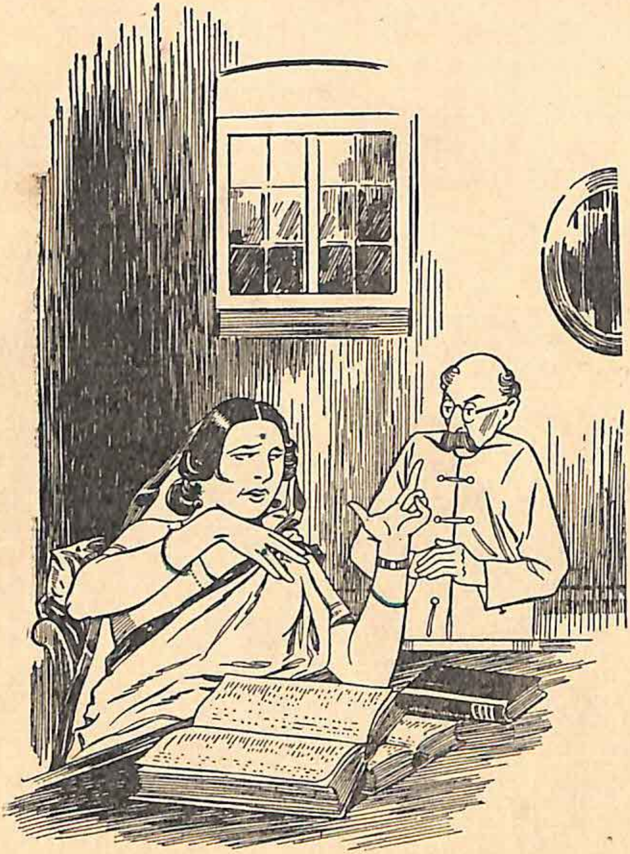
সুষেণবাবুও তেমনি সমস্ত কর্তৃত্ব খোয়াইয়া পুরুষত্বের চিহ্ন স্বরূপ এই গোঁপ জোড়াটি সযত্নে বজায় রাখিয়াছেন। ঘরে আসিয়া ঘাড় নীচু করিয়া সবিনয়ে বলিলেন—'ডেকেছ?'

জিগীষা দেবী ছেলেদের দেখাইয়া বলিলেন—'এঁরা বাণী নিতে এসেছেন।'

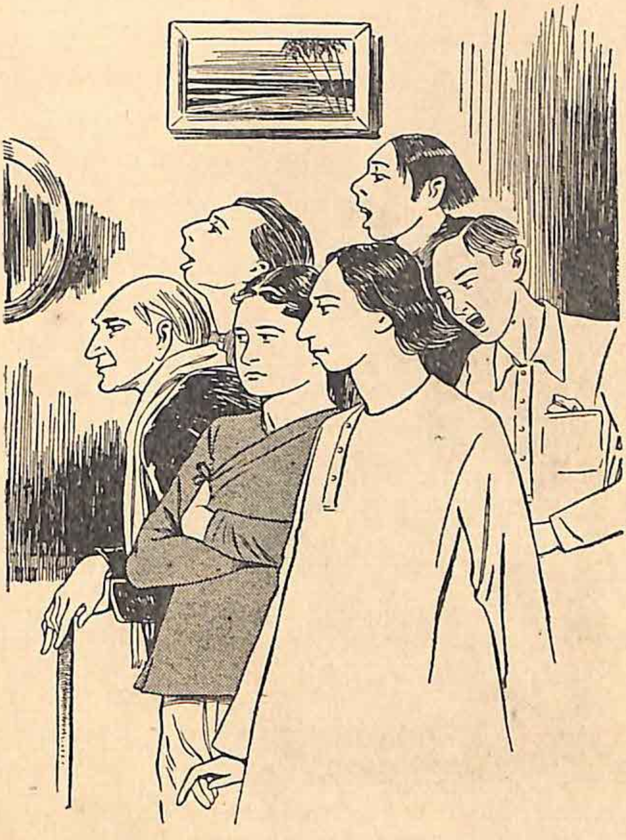
সুষেণবাবু চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন—'বানি? এই যে সেদিন ননি-সেকরা বিয়াল্লিশ টাকা নিয়ে গেল?'

জিগীষা দেবী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—'ঈডিয়ট! সেকরার বানি নয়, আমার মুখের বাণী। যাও, সবুজ ফাউণ্টেন পেনটা আর এক শীট কাগজ নিয়ে এস।'

সুষেণবাবু কাগজ কলম আনিলেন। জিগীষা দেবী খচখচ করিয়া কয়েকটা লাইন লিখিয়া বলিলেন—'শুনুন।—ওগো ছেলেরা, আমি বুঝেছি তোমাদের ব্যথা, কিন্তু জগৎ পারবে না তা বুঝতে, কারণ স্থবিরের প্রাচীন-প্রস্তর-যুগ শেষ হয় নি এখনও। প্রবীণের রক্ত আর তরুণের খুন, ধনীর রুধির আর শ্রমীর লোহু, রেড়ির তেল আর ঝরনার জল কখনই মিশ খায় না। অতএব তোমাদের হ'তে হবে স্বাবলম্বী স্বপ্রতিষ্ঠ। বানাও আশ্রম, গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে, নগরে নগরে। বানাও তারুণ্যের তপোবন, নবীনতার নীড়, যৌবনের দুর্গ। তোল চাঁদা—লাখ, দশ লাখ, কোটি। আপাতত এনে দাও আমাকে হাজার দশেক, তাতেই কাজ আরম্ভ হ'তে পারবে।'



এঁরা বাণী নিতে এসেছেন



চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'বাঃ অতি চমৎকার, খাসা। বাঁটলো, কাগজখানা যত্ন ক'রে রেখে দিস। তবে আজকের মতন আসি মা-লক্ষ্মী।'

বাঁটলো। অসময়ে অনেক উৎপাত করলুম, মাফ করবেন।

জিগীষা। না না, উৎপাত কিসের। আচ্ছা, আমি এখন মিটিংএ যাচ্ছি, নমস্কার।

জিগীষা দেবী প্রস্থান করিলেন। চাটুজ্যে মহাশয়রাও উঠিলেন, কিন্তু সুষেণবাবু বলিলেন—'আপনাদের কি বড্ড তাড়া? বসুন না একটু।'

চাটুজ্যে। আপনিও একটা বাণী দেবেন নাকি?

সুষেণবাবু একবার দরজার বাহিরে উঁকি মারিয়া বলিলেন—'বাণী-ফাণি আমি বুঝি না মশায়, ও হচ্ছে মেয়েলী ব্যাপার। আমি বুঝি শুধু কাজ। বলছিলুম কি—আপনারা কানাই ঘোষালকে চেনেন? চ্যাম্পিয়ন ওআন-লেগার, সেনেট হাউসের চাতালে নাগাড় পঁচাত্তর ঘণ্টা এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল? আমার খুড়তুতো ভাই হয়।'

চাটুজ্যে। বটে?

সুষেণ। হাঁ। বলাই বাঁড়ুজ্যের নাম শুনেছেন? যে ছোকরা সেদিন গড়ের মাঠে তিনটে গোরাকে ছাতা-পেটা করেছিল? আমার আপন মাসতুতো ভাই।

চাটুজ্যে। বলেন কি মশায়! আপনারা দেখছি বীরের

বংশ, বড় সুখী হলুম আলাপ ক'রে। আর কিছু বলবার নেই তো? আচ্ছা, বসুন তা হ'লে, নমস্কার।

সুষেণবাবু সহসা মুখখানি করুণ করিয়া বলিলেন—'পাঁচটা টাকা হবে কি? মাসকাবার হ'লেই শোধ ক'রে দেব।'

বাঁটলো একটা আধুলি ফেলিয়া দিল। ছেলেদের দল ও চাটুজ্যে মহাশয় বাহিরে আসিলেন।

রাস্তায় আসিয়া চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'আর ভাবনা কি, কেল্লা মার দিয়া। এখন চট্‌পট আশ্রমের টাকাটা যোগাড় ক'রে জিগীষা দেবীর হাতে দাও। আচ্ছা, আমি এখন চললুম। কার্ত্তিক, তুমি তা হ'লে আজ রাত্রে বাঁটলোদের বাড়ি থাকছ? বেশ, কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

চাটুজ্যে মহাশয় চলিয়া গেলে ঘনেন বলিল—'তাই তো, দ-শ হা-জার টাকা! কিন্তু এর কমে আশ্রম হবেই বা কি ক'রে। অন্তত পঞ্চাশ জনের থাকবার জায়গা চাই, শোবার ঘর ডাইনিং রুম ড্রয়িং রুম লাইব্রেরি টেনিস কোর্ট সমস্তই চাই, জিগীষা দেবী খুব কম ক'রেই এস্টিমেট করেছেন। কিন্তু টাকা পাওয়া যায় কোথায়? বাঁটলো কি বলিস?'

বাঁটলো। আমি বলি কি—কার্ত্তিক আজ রাত্রে খুব ঠেসে

খেয়ে নিয়ে কাল থেকে উপবাস আরম্ভ করুক, আর আমরা চারিদিকে সভা ক'রে বক্তৃতা দি—হে দেশবাসী, এই যে একটি তরুণ আশ্রম বানাবার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে বসেছে আর তোমরা হেসে খেলে বেড়াচ্ছ, এটা কি ঠিক হচ্ছে? দাও দশ হাজার টাকা তুলে, তা হ'লেই বেচারা চাট্টি ভাত খাবে।

ঘনেন। উপোস ক'রে কাজ উদ্ধার করা হচ্ছে মেয়েলী ট্যাকটিক্স, আমার তাতে সিমপ্যাথি নেই।

বাঁটলো। পুরুষোচিত পন্থা আছে, কিন্তু তাতে কিছু সময় লাগবে। কাত্তিক আমেরিকায় যাক, ঝাঁকড়া চুল রাখুক, স্বামীজী হয়ে জে'কে বসুক। বিস্তর মেম ওর চেলা হবে, টাকাও আসবে ঢের। সেখানেই আশ্রম খোলা যাবে, আমরাও গিয়ে জুটব।

কার্তিকের এসব যুক্তি পছন্দ হইল না। বলিল—'বাঁটলো, পিস্তলের দাম কত রে?'

বাঁটলো ফেরিওয়ালার সুরে বলিল—'জাপানবালা দো আনা, জার্মানবালা দো আনা, সস্তাবালা দো আনা। পিস্তল কি হবে রে গাধা?'

কার্তিক উত্তেজিত হইয়া বলিল—'ডাকাতি ক'রব, খুন ক'রব, জেলে যাব, ফাঁসি যাব, আত্মীয় স্বজনের নাম ডোবাব, জগৎ আমার শত্রু, কোথাও আমার স্থান নেই!'

বাঁটলো। আপাতত আমাদের বাড়িতে স্থান আছে!

রাত্রিটা তো কাটিয়ে দে, তার পর সকালবেলা মাথা ঠাণ্ডা হ'লে যা হয় করিস।

গোপাল ও ঘনেন নিজের নিজের বাড়ি গেল। কার্তিক নীরবে বাঁটলোর সঙ্গে চলিল। বাড়ি আসিয়া বাঁটলো কার্তিককে বাহিরের ঘরে বসাইয়া তাহার শুইবার ব্যবস্থা করিতে উপরে গেল। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিল কার্তিক পালাইয়াছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। বৃদ্ধ গোবিন্দবাবু দোতলার ঘরে খাটের উপর গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সহসা তাঁহার চোখের উপর একটা তীব্র আলোক পড়ায় ঘুম ভাঙিয়া গেল। শুনিলেন, চাপা গলায় কে বলিতেছে—'খবরদার, চেঁচালেই গুলি ক'রব। লোহার আলমারির চাবি—শিগ্‌গির।'

গোবিন্দবাবু বুঝিলেন, আধুনিক চোর। একটা স্থবির চাকর ছাড়া বাড়িতে এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, তিনি নিজেও কয়দিন হইতে বাতে পঙ্গু হইয়া আছেন। অগত্যা বলিলেন —'চাবি তো আমার কাছে নেই, গিন্নীর কাছে, তিনি আবার চন্দননগরে তাঁর ভাইএর বাড়ি গেছেন্।'

চোর। মনিব্যাগ? ঘড়ি-টড়ি? আংটি?

গোবিন্দ। ঐ ড্রেসিং টেবিলটার টানার মধ্যে যা কিছু আছে। কিন্তু চেক বইখানা নিও না বাপু, সেটা তোমার কোনও কাজে লাগবে না।

টর্চের আলো ঘরের চারিদিকে ঘুরাইয়া চোর টেবিল খুঁজিতে লাগিল। অন্ধকারে সহসা টেবিলটায় ধাক্‌কা খাইয়া মেজেতে বসিয়া পড়িয়া চোর বলিল—'উঃ!'

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'কি হ'ল?'

সাড়া নাই। কিছুক্ষণ পরে চোর আবার 'উঃ' করিল। গোবিন্দবাবু ভাবিত হইলেন। খাটের পাশেই একটা বাতির সুইচ, সেটা টিপিয়া ঘর আলোকিত করিলেন। দেখিলেন, চোর টেবিলের পাশে মেজেতে বসিয়া আছে, তাহার কোমরে হাত, মুখে কাতর ভঙ্গী।

গোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমারও বাত নাকি?'

চোর। উঁহু। মাস-দুই আগে ডেঙ্গু হয়েছিল, তার পর থেকে মাঝে মাঝে একটুতেই খিল ধরে। উঃ, উঠতে পারছি না।

গোবিন্দ। উঠতে পারবে একটু পরে। ওষুধপত্র খাচ্ছ?

চোর। ডেঙ্গু যখন ছিল তখন খেতুম। এখন আর খাই না।

গোবিন্দ। অন্যায় ক'রছ, ডেঙ্গু বড় খারাপ ব্যারাম। দিন-কতক তুলসীপাতার রস দিয়ে কুইনীন খেয়ে দেখ দিকি,

ভারি উপকারী। যদি এ সময় পুরী কি দেওঘর গিয়ে থাকতে পার তো আরও ভাল।

চোর একটু হাসিয়া বলিল—'দেওঘর না শ্রীঘর?'

গোবিন্দ। তাও তো বটে, বুড়ো মানুষ, ভুলেই গিয়েছিলুম যে তুমি একজন চোর। কিন্তু ভয় নেই, আইন-আদালত আমার আর ভাল লাগে না। সাজা যা দেবার আমিই দেব, তবে বাতে কাবু করেছে এই যা মুশকিল।

চোর এইবার একটু সুস্থ হইয়া আস্তে আস্তে উঠিল।

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'ব'স ঐ চেয়ারটায়।'

তরুণ চোর। পিছনে ওলটানো বড় বড় চুল, নাক-টেপা চশমা, তাহাতে দু-ইঞ্চি চওড়া কাল ফিতা, কাবুলী ফ্যাশনে ধুতি পরা, গায়ে রেশমী পাঞ্জাবি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, হাতে রিস্ট ওআচ ও পিস্তল।

গোবিন্দ। ও পিস্তলটা কোথা থেকে পেলে?

চোর। মুরগিহাটা থেকে, ছ-আনা দাম।

গোবিন্দ। খেলনা? তবু ভাল, আর্ম্স অ্যাক্টে পড়বে না। স্বদেশী ডাকাত?

চোর। ভবিষ্যতে তাই হয়তো হ'তে হবে। আপাতত ঝোঁকের মাথায়।

গোবিন্দ। বাপ নেই?

চোর। আছেন।

গোবিন্দ। তাড়িয়ে দিয়েছেন?

চোর। তিনি ঠিক তাড়ান নি, আমিই গৃহত্যাগ করেছি।

গোবিন্দ। ও, বুদ্ধদেব শ্রীচৈতন্যের মতন! কি হয়েছে বাপু, বৈরাগ্য ?

চোর। বৈরাগ্য নয়, পৈতৃক জুলুম। বাবা হচ্ছেন সেকেলে জবরদস্ত পিতা। আজ সন্ধ্যাবেলা বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলে খাচ্ছি, হঠাৎ বাবা এসে খামকা যা-তা ব'লে গালাগালি দিলেন—একেবারে দু-শ লোকের সামনে। তার পর বললেন—এই কার্ত্তিক, অঘ্রান মাসে তোর বিয়ে, রাখাল সিংগির মেয়ের সঙ্গে। আমি জবাব দিলুম—কখনই নয়।

গোবিন্দ। আর অমনি সিঁদকাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লে ?

চোর। আমার মনের অবস্থাটা আপনি বুঝতে পারছেন না সার্। বাবা তো রেগে শেয়ালদ চ'লে গেলেন। আমি তখন ফিউরিয়স, বন্ধুরা নিয়ে গেল জিগীষা দেবীর কাছে—বিগ হামবগ। তার পর বাঁটলো আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। থাকতে পারলুম না, চুপি চুপি পালিয়ে এলুম, একটা কিছু ভয়ংকর করতে চাই—চুরি, ডাকাতি, খুন।

গোবিন্দ। রাখাল সিংগির মেয়েটা বিশ্রী বুঝি ?

চোর। ভগবান জানেন আর বাবা জানেন। যার দেহের মনের কোনও সংবাদ আমি জানি না তাকে বিয়ে করি কি ক'রে বলুন তো? পাড়াগেঁয়ে বাপ-মার মেয়ে, বিদেশে মামার কাছে মানুষ হয়েছে, মামা শুনেছি একটি আস্ত পাগল,

ভাগনীটিকে নাকি বন্য জন্তু বানিয়েছেন। আমার মানসী প্রিয়া অন্য প্যাটার্নের, সিন্‌থেসিস অব পার্ফেক্‌শন।

গোবিন্দ। কি রকম শুনি।

চোর সোৎসাহে বলিল—'শুনবেন?' পাঞ্জাবির পাশের পকেট হইতে একটা মোটা খাতা টানাটানি করিয়া বাহির করিল।

গোবিন্দ। কি ওটা, সিঁদকাঠি?

চোর। উঁহু, কবিতার খাতা। শুনুন।—জানতে চাও কি হৃদয়রানী, অদেখা ঐ মূর্তিখানি, রূপে গুণে কাল্‌চরেতে কেমন হ'লে ধন্য মানি—

গোবিন্দ। থাক থাক, আমি বুঝে নিয়েছি। সেই মেয়েটার নাম কি?

চোর। ডাকনাম নেড়ী, ভাল নাম জানি না।

গোবিন্দ। আর তোমার নাম?

চোর। কার্তিক ঘোষ।

গোবিন্দ। বল কি হে? কাত্তিক ঘোষের হৃদয়রানী হবে নেড়ী! নেলী হ'লেও বা কথা ছিল।

নীচে মোটর থামার অস্ফুট আওয়াজ হইল, তাহার পর ঘরের বাহিরের বারান্দায় খুট খুট পদশব্দ। গোবিন্দবাবু হাঁকিলেন—'কেরে নেড়ী এলি? এত রাত হ'ল যে?

বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে উত্তর আসিল—'মামা এখনও জেগে

আছ? ওঃ, কি ভোজটাই খাইয়েছে, পঞ্চাশটা কোর্স, একেবারে টপিং!'

একটি সালংকারা অনবদ্যাঙ্গী তরুণী ঘরে প্রবেশ করিয়া একজন অপরিচিত লোক দেখিয়া চিত্রার্পিতাবৎ দাঁড়াইল। চোর হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল।

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'হাঁ, তার পর কি বলছিলে হে ছোকরা—রূপে গুণে কাল্চরেতে? রূপ তো দেখতেই পাচ্ছ। গুণ আর কাল্চর? নেড়ী, বানান কর্ তো প্রতিদ্বন্দ্বী।'

নেড়ী বলিল—'পয় রফলা তয় হস্সি' ইত্যাদি। ইত্যবসরে চোর পিছন ফিরিয়া একটা ছোট আরশি পকেট হইতে বাহির করিয়া চট্ করিয়া মাথার চুল ঠিক করিয়া লইল।

গোবিন্দ। দুইএর স্কোয়ার রুট কত হয় রে?

নেড়ী। 1.41425

গোবিন্দ। বস্ বস্, ফিফ্থ প্লেস পর্যন্তই ঢের, কি বল হে ছোকরা। আচ্ছা নেড়ী, তোর মতে আধুনিক লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?

নেড়ী। যদি কীর্তনতাল অথর বল, তবে আঁরি মব্লাঁর কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। আধুনিক উপোসী সাহিত্যের ইনিই সবচেয়ে বড় এক্স্পনেণ্ট্। কেমন একটা করুণ বিশ্বলুট ভাব, যেন একটা দড়িছেঁড়া পিয়াসী বুভুক্ষা—ভারি মিষ্টি লাগে কিন্তু। আর, এঁর ঠিক উল্টো হচ্ছেন জাপানী

রেনেসাঁসের কবি সিমাৎসু ফুজিয়ামা। এ'র লেখায় কেমন একটা ঔদরিক ঔদার্য, যেন একটা পূর্তির পুলক, যেন একটা হৃষ্ট হ্রেষা—ভারি অবাক লাগে কিন্তু।

গোবিন্দ। আচ্ছা। শেষের কবিতার শেষ কবিতার মোদ্দা কথাটা কি রে?

নেড়ী। উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে, সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।

গোবিন্দ। বাঃ। এইবার তুই একটা কিছু বাজা দিকি।

নেড়ী একটা ব্যাঞ্জো লইয়া টুং টাং করিতে লাগিল। চোর গোবিন্দবাবুকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—'নাইন্থ্ সিম্ফোনি বাজাচ্ছেন বুঝি?'

গোবিন্দ। উঁহু, ওসব সেকেলে সুর নেড়ীর পছন্দ নয়, বোধ হয় শালা-লুট-লিয়া বাজাচ্ছে। নেড়ী, একটা রাশিয়ান ঠুংরি গা তো।

নেড়ী। যাও, এখন আমি পারি না, ঘুম পায় না বুঝি? আচ্ছা মামা, ইনি কে তা তো বললে না।

গোবিন্দ। ইনি একজন চোর। হঠাৎ কোমরে খিল ধরায় বাধা পেয়েছেন।

নেড়ী লাফাইয়া বলিল—'অ্যাঁ—চোর? এতক্ষণ ব'লতে হয়!'

ঘরের কোণে গিয়া চট্ করিয়া টেলিফোনটা তুলিয়া লইয়া নেড়ী বলিল—'পার্ক এট-সেভ্ন—হেলো বালিগঞ্জ থানা—'



'হেলো বালিগঞ্জ থানা'

গোবিন্দ। খবরদার নেড়ী, টেলিফোন রেখে দে—স্থির হয়ে ব'স্।

নেড়ী টেলিফোন রাখিয়া বলিল—'বা রে, চোরকে অম্‌নি ছেড়ে দেবে? তোমার সেই কুকুর-মারা চাবুকটা কোথায়, আমিই নাহয় ঘা-কতক লাগিয়ে দি—'

গোবিন্দ। এ আমার চোর, তুই মারবার কে!

নেড়ী চঞ্চল হইয়া বলিল—'তবে একটা দড়ি, বিছানা-বাঁধা স্ট্রাপ, কোথা আছে বল না মামা—বেঁধে ফেলি, নয়তো পালাবে—'

চোর সবিনয়ে বলিল—'আজ্ঞে না না, আমি পালাব না।'

নেড়ী ব্যস্ত হইয়া দড়ি খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু পাইল না।

চোর। আমার এই রুমাল দেখুন তো, যদি কাজ চলে।

নেড়ী। নো, থ্যাংক্স্‌।

নেড়ী তাহার শাড়ির আঁচল দিয়া চোরকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল, চোর সুবোধ বালকের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল। নেড়ী বলিল—'মামা, বেঁধে ফেলেছি, এইবারে তুমি থানায় টেলিফোন কর শিগ্‌গির।

গোবিন্দ। আমার এখন ওঠবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু চোরের সঙ্গে তুইও যে বাঁধা পড়লি!

নেড়ী অস্থির হইয়া বলিল—'আমি? কখ্‌খনো নয়—উঃ আঁচলটা কি শক্ত, ছেঁড়া যায় না—একটা কাঁচি— কাঁচি—'

চোর। দেখুন তো, আমার বুক-পকেটে আছে।

নেড়ী চোরের পকেট তল্লাশ করিল কিন্তু কাঁচি পাইল না।

চোর। আচ্ছা পাশের পকেট দেখুন তো।

সেখানেও কাঁচি নাই। নেড়ী বলিল—'মিথ্যাবাদী জোচ্চোর!'

চোর বলিল—'আজ্ঞে না না। আচ্ছা আপনি বাঁধন খুলে দিন, আমি কথা দিচ্ছি পালাব না, আপন মাই অনার!'

নেড়ী। আহা কি কথাই বললেন, চোরের আবার অনার!

উপায়ান্তর না দেখিয়া নেড়ী বাঁধন খুলিয়া দিল।

গোবিন্দবাবু বলিলেন—'নেড়ী, যা লক্ষ্মীটি, খানকতক গরম গরম কাটলেট ভেজে আন, আর এক কাপ চা। আর পাশের ঘরে এঁর শোবার ব্যবস্থা ক'রে দে—এত রাত্রে বেচারা যায় কোথা।'

নেড়ী মামার আজ্ঞা পালন করিতে গেল।

গোবিন্দ। কেমন দেখলে কার্ত্তিক বাবাজী?

কার্তিক। চমৎকার! আশ্চর্য! এক্স্কুইজিট!

গোবিন্দ। মানসী প্রিয়ার সঙ্গে মিলছে?

কার্তিক। হুবহু। কিন্তু বাবা কি করবেন তাই ভাবছি। এ নেড়ী তো তাঁর মানসী নেড়ী নয়!

গোবিন্দ। কোনও ভয় নেই তোমার, আমার শিক্ষায় মোটেই খুঁত পাবে না। এই নেড়ী যখন শ্বশুরবাড়ি যাবে

তখন লাল চেলি প'রে এক হাত ঘোমটা টেনে পঞ্চাশটা গুরুজনকে ঢিপ ঢিপ ক'রে প্রণাম করবে, রান্নাঘরে গিয়ে কোমর বেঁধে দু-শ লোকের শাকের ঘণ্ট রাঁধবে। আবার ওকে যদি সিমলা দিল্লিতে ভাইসরয়ের ডান্সে নিয়ে যাও তবে লাট-বেলাটের সঙ্গে অক্লেশে বার-কুড়িক নেচে দেবে, জার্মান কনসলের কানে চিমটি কাটবে, সার্ জম্বুস্বামী আয়ারের টিকি ধ'রে টানবে।

কার্তিক। ওঃ।

গোবিন্দ। কিহে, ভয় পেলে নাকি?

কার্তিক। আজ্ঞে না, আনন্দ, আনন্দ!

১৩৩৬—১৩৩৭

প্রেমচক্র

'এখনও বল্ হাবলা।'

'হাঁ হাঁ, আমি বলছি তুমি ফেলে দাও মামা।'

'কিন্তু লোকে কি বলবে?'

'ভালই বলবে।'

'তোর মামী?'

'মামী খুশী হবে, তুমি দেখো।'

'তুই না-হয় একবার ওপরে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে আয়।'

'তা আসছি। তুমি ততক্ষণ বেশ ভিজিয়ে নরম ক'রে রাখ।'

হাবলা ওপরে গেল। আমি বুরুশ ঘষতে লাগলুম। হুকুম এলেই জয়-মা-কালী ব'লে চোপ বসাব।

কিন্তু শুভকর্মে অনেক বাধা। হাবলার ছোট ভাই বঙ্কা ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকে বললে—'ওকি হচ্ছে মামা?'

'কি আবার হবে, গোঁপটা ফেলে দেব।'

বঙ্কা বললে—'গোঁপ এখন থাকুক। দাও ধাঁ ক'রে একটা গল্প লিখে। একটা মাসিক পত্রিকা বার করেছি—চিরন্তনী।'

'ক-মাস বার হবে?'

'চিরকাল। এ পত্রিকা মরবে না, তুমি দেখে নিও। দস্তুরমত এস্টিমেট ক'রে আটঘাট বেঁধে নামা হচ্ছে। পঁচিশজন নামজাদা লেখকের সঙ্গে কনট্রাক্ট করেছি। প্রতি সংখ্যায় উনিশটা গল্প—পাঁচটা সোজা প্রেম, দশটা বাঁকা প্রেম, চারটে লোমহর্ষণ। প্রথম সংখ্যা প্রায় ছাপা হয়ে এল, কেবল শেষ ফর্মার লেখাটা যোগাড় হয়ে ওঠে নি তাই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। দাও চট্‌পট একটা লিখে।'

'কেন তোর কনট্রাক্টারদের কাছে যা না।'

'তাদের খোশামোদ করবার আর সময় নেই, তুমিই একটা লিখে দাও, আজই চাই কিন্তু।'

এমন সময় হাবলা ফিরে এল। মুখখানা হাঁড়ির মতন ক'রে বললে—'মামী রাজী নয়।'

'কি বললে?'

'বললেন — খবরদার, ঐ তো মুখের ছিরি, গোঁপ ফেললে দেখাবে যা, মরি মরি! মামা, অমন মুষড়ে গেলে চলবে না কিন্তু। প্রতিশোধ নিতে হবে, ভীষণ প্রতিশোধ। আমি বলছি তুমি দাড়ি রাখ, দিব্যি মুখ-ভরা কোমর পর্যন্ত, নিরঞ্জন সিংএর মতন।'

বঙ্কা অস্থির হয়ে বললে—'আঃ, কেবল গোঁপ আর দাড়ি! তার চেয়ে ঢের বড় জিনিস সৃষ্টি করবার আছে। মামা, তুমি অন্য চিন্তা ত্যাগ ক'রে গল্প লেখ।'

হাবলা বললে—'তোদের সেই পত্রিকাটার জন্যে বুঝি?'

বঙ্কা জবাব দিলে না। সে তার দাদাকে গ্রাহ্য করে না, কারণ হাবলা একটু সেকেলে গোছের, আর বঙ্কা হচ্ছে খাজা-তরুণ। আমি বললুম—'বঙ্কার পত্রিকার এক ফর্মা খালি রয়েছে, তুই একটা লেখা দে না হাবলা।'

হাবলা বললে—'কবিতা চায় তো দিতে পারি। পুঁটুর বিয়ের জন্যে একটা লিখেছি, তাই একটু অদলবদল ক'রে দিলে চলবে।'

বিয়ের পদ্যে হাবলার হাত খুব পাকা। তার বন্ধুরা বলে, এ লাইনে ও-ই এখন সম্রাট্। হাবলাদের রাবণের বংশ, জেঠতুতো খুড়তুতো পিসতুতো মাসতুতো মামাতোর অন্ত নেই, তার সমস্ত তাল সামলায় শ্রীমান্ হাবুলচন্দ্র। বছরের মধ্যে গোটা-পাঁচেক হৃদয়বাণী, গণ্ডা-দুই মর্মোচ্ছ্বাস, ছ-সাতটা প্রীতি-উপহার তাকে লিখতেই হয়। ভাষা ছন্দ ভাব তিনটেই বেশ স্ট্যাণ্ডারডাইজ ক'রে ফেলেছে। আজি কি সুন্দর প্রভাত, নীল নভে পূর্ণচন্দ্র উঠিছে, মলয় মৃদু হিল্লোলে বহিছে, কুসুম থরে থরে ফুটিছে, হৃদয়ে শাহানা রাগিণী বাজিছে। কেন এ সব হচ্ছে? কারণ, আমাদের স্নেহের পুঁটুরানীর সঙ্গে শ্রীমান্ চামেলিরঞ্জন বি. এস-সির শুভপরিণয়। অতএব হে বিভু, তুমি প্রচুর মধুলেপন ক'রে এই দুটি তরুণ হিয়া জুড়ে দাও।

কিন্তু বঙ্কার তা পছন্দ নয়। বললে—'রাবিশ। ওসব সেকেলে ছড়া একদম চলবে না।'

আমি বললুম—'খুব চলবে। এই কবিতাই কিছু অদলবদল ক'রে দিলে আধুনিক হয়ে দাঁড়াবে। দু-চারটে ভূমা, গোটা-তিন অবদান, একটু রুদ্র শিহরন, একটু রিনকি-ঝিনি—'

বঙ্কা তিড়বিড় ক'রে হাত-পা নেড়ে বললে—'না না না। ওসব পচা কবিতা একদম চলবে না। মামা, তুমি গল্প লেখ, বেশ ঘোরালো প্লট চাই, শিগ্‌গির দিতে হবে কিন্তু।'

বললুম—'আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।'

'ছবিও চাই কিন্তু।'

'বলিস কিরে! আমার চোদ্দপুরুষ কখনও ছবি আঁকে নি।'

'বাঃ, সেই যে তুমি ঘোষ কোম্পানির আপিসে ছবি আঁকতে?'

কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। চার বার বি. এ. ফেল হবার পর বাবার উপরোধে দিন-কতক ইঞ্জিনিয়ার ঘোষ কোম্পানির আপিসে প্ল্যান আঁকা শিখি। কত রকম যন্ত্র, কত রকম রং। আমি মনের সুখে সেট-স্কোয়ার দিয়ে পুকুর আঁকতুম আর কম্পাস দিয়ে চাঁদামাছ আঁকতুম। ঘোষ-সায়েব দেখেও দেখতেন না, পিতৃবন্ধু কিনা। বঙ্কা সেই থেকে ঠাউরেছে আমি একজন আর্টিস্ট। তা হোক, একটু চেষ্টা করলে যদি একাধারে লিখিয়ে আর আঁকিয়ে হ'তে পারি তো মন্দ কি।

বঙ্কাকে বললুম—'কাল সন্ধ্যাবেলা আসিস, দেখি কি করতে পারি।'

পরদিন সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে বঙ্কা এসে হাজির। সঙ্গে আবার তার ছোটবোন চিংড়িকে এনেছে। সে ফার্স্ট-ইয়ারে পড়ে, গল্প আর ছবির একজন মস্ত সমঝদার। জিজ্ঞাসা করলুম—'হাবলা এল না?'

বঙ্কা বললে—'দাদা ভীষণ চটেছে। বললে, দেখি আমাকে বাদ দিয়ে তোদের পত্রিকা ক-দিন চলে। দাদা ম্যালেরিয়া-বধ কাব্য শুরু করেছে, শ্যাওড়াপুলি-হিতৈষীতে ক্রমশ প্রকাশ্য। যাক, তুমি চট্‌পট প'ড়ে ফেল মামা। লেখাটা এখনি ছাপাখানায় দিতে হবে, ছবির ব্লক করাতে হবে। নাও, আরম্ভ কর।'

আরম্ভ করলুম।—

'স্থান—নৈমিষারণ্যের ঋষিপাড়া। কাল—সত্যযুগ। পাত্র—তিন ঋষিকুমার, হারিত জারিত আর লারিত। পাত্রী—তিন ঋষিকন্যা, সমিতা জমিতা আর তমিতা।'

বঙ্কা বললে—'সত্যযুগে গেলে কেন? আধুনিক যুগ হ'লেই বেশ হ'ত, প্রেমের পথে কোন বাধা পেতে না। যদি বর্তমান যুগধারার সঙ্গে তোমার পরিচয় না থাকে তবে বৌদ্ধ মুঘল আমল চালাতে পারতে।'

বললুম—'তুই কতটুকু খবর রাখিস? যদি হৃদয়ের অবাধ প্রসার আর কল্পনার উদ্দাম প্রবাহ দেখাতে হয় তবে সত্যযুগে প্লট ফাঁদতেই হবে।'

চিংড়ি বললে—'যেমন কচ ও দেবযানী।'

'ঠিক। চিংড়ি, তুই সব জানিস দেখছি।'

চিংড়ি খুশী হয়ে উত্তর দিলে—'মামা, তুমি কারও কথা শুনো না, চালাও সত্যযুগ।'

'চালাবই তো। তার পর শোন্।—হারিত ভালবাসে সমিতাকে, কিন্তু সমিতা চায় জারিতকে। আবার জারিত চায় জমিতাকে, অথচ জমিতার টান লারিতের ওপর। আবার লারিত ভালবাসে তমিতাকে কিন্তু তমিতার হৃদয় হারিতের প্রতি ধাবমান।'

বঙ্কা বললে—'ভয়ংকর গোলমেলে প্লট, মনে রাখা শক্ত।'

'মোটেই না। এক নম্বর চিত্র দেখ।'

চিংড়ি বললে—'উঃ, করেছ কি মামা! এ যে ইটার্নাল ট্র্যাংগ্‌লের বাবা, হোপলেস হেক্সাগন! আচ্ছা মামা, মধ্যি-খানে এটা কি এঁকেছ, চামচিকে?'

'চামচিকে নয়। ইনি হচ্ছেন খোদ কন্দর্প। অতনু কিনা, তাই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। লেন্স দিয়ে দেখলে টের পাবি, ওঁর দুই হাতে দুই ধনুক, তার ছিলের এক প্রান্ত খোলা, তাই দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে ওপরে নীচে সপাসপ চাবুক লাগাচ্ছেন, আর প্রেমচক্র বন্‌বন ক'রে ঘুরছে।'

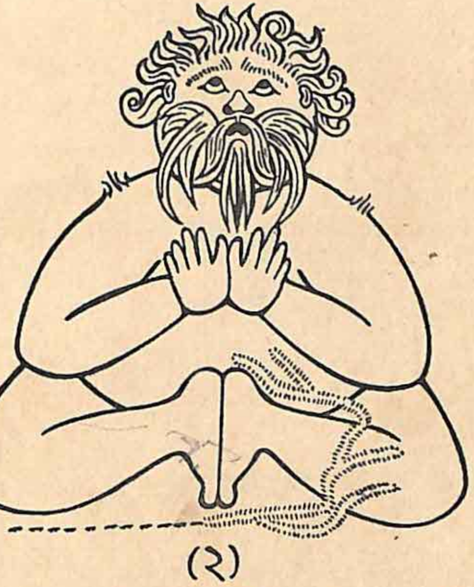
চিংড়ি বললে—'বন্‌বন সেকেলে ভাষা। বাঁইবাঁই লেখ, অথবা পাঁইপাঁই।'

'ঠিক। প্রেমচক্র বাঁইবাঁই অথবা পাঁইপাঁই ক'রে ঘুরছে। এই চক্রের বাইরে আর একটি মূর্তি আছেন, তিনি হলেন



ভুণ্ডিল মুনি। ব্রহ্মচর্য শেষ করার পর গৃহী হবার জন্য কিছুদিন চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনও ঋষিকন্যাই এঁকে বিয়ে করতে রাজী হয় নি, কারণ ভুণ্ডিল যেমন মোটা তেমনি

গম্ভীর, আর তাঁর বয়স প্রায় চার হাজার বৎসর, অর্থাৎ এই কলিযুগের হিসেবে চল্লিশ। অবশেষে তিনি বুঝলেন যে এই দৃশ্যমান জগৎটা নিছক মায়া, আর নারী সেই মায়াসমুদ্রের ভুড়ভুড়ি, তাদের আকার আছে কিন্তু বস্তু নেই। তখন তিনি



(২)

আশ্রম ত্যাগ ক'রে নিবিড় অরণ্যে গিয়ে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবন্ধ ক'রে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। দু নম্বর চিত্র দেখ।'

চিংড়ি বললে—'মামা, এবার আমাদের বার্ষিক উৎসবে তোমার গল্পটা অভিনয় করব। সরসী-দি যদি ভুণ্ডিল মুনি

সাজেন, ওঃ, কি চমৎকার মানাবে! গোঁপ লাগবে না, শুধু চাট্টি দাড়ি আনালেই চলবে। তার পর প'ড়ে যাও মামা।'

'একদা বসন্তসমাগমে যখন বনভূমি রমণীয় হয়ে উঠেছে, অশোক কিংশুক কুরুবক পুন্নাগ প্রভৃতি তরুরাজি পুষ্পভারে নমিত হয়েছে, ভ্রমরের গুঞ্জন আর কোকিলের কূজন বুড়ো বুড়ো তপস্বীদের পর্যন্ত উদ্‌ব্যস্ত ক'রে তুলেছে, তখন এক মধুর অপরাহ্নে সমিতা জমিতা আর তমিতা তিন সখীতে মিলে গোমতী-তীরে বায়ু সেবন করতে করতে মনের কথা আলোচনা করছিল। ঠিক সেই সময়ে হাত-তিরিশ পিছনে একটি আম্রকাননের অন্তরালে হারিত জারিত আর লারিত ঘাসের ওপর ব'সে আড্ডা দিচ্ছিল।'

চিংড়ি বললে—'ঋষিকন্যাদের সাজ কি রকম তা লিখলে না?'

'হচ্ছে, হচ্ছে।—সত্যযুগে বস্ত্র বড়ই দুর্মূল্য ছিল। ঋষিকন্যারা একখানি সাদাসিদে খাপী বল্কল পরিধান করতেন, আর একখানি শৌখিন মিহি বল্কল গায়ে তেড়চা ক'রে বাঁধতেন।'

চিংড়ি বললে—'খুব আর্টিস্টিক সাজ। আচ্ছা মামা, স্টেজে ব্রাউন রঙের জর্জেট প'রলে ঠিক বল্কলের মতন দেখাবে না?'

'নিশ্চয়। তার পর শোন্।—ঋষিপত্নীদের সাজও ঐরকম। মাথায় কাপড় টানবার উপায় ছিল না, লজ্জা প্রকাশ করবার দরকার হ'লে কিঞ্চিৎ জিহ্বা প্রদর্শন করতেন। উঁচুদরের মুনিঋষিরা, যাঁরা রাগ-দ্বেষ-শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠতেন, তাঁদের কিছুই দরকার হ'ত না; তবে তাঁরা লোকালয়ে যেতে পারতেন না, কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রত। সাধারণ ঋষিরা বল্কলই ধারণ করতেন, কিন্তু ছেলে-ছোকরাদের ব্যবস্থা ছিল বেল-কাঠের কৌপীন।'

বঙ্কা বললে—'বেল-কাঠের?'

'হাঁ। কর্তারা বলতেন—তোদের এখন ব্রহ্মচর্যের সময়, বেশী বিলাসিতা ভাল নয়। তোরা বেদ পড়বি, ধেনু চরাবি, কাঠ কাটবি, বনে-বাদাড়ে ঘুরে হরদম বল্কল ছিঁড়বি। কাঁহাতক যোগাব? তার চেয়ে কাঠের কৌপীন পরিধান কর্, তোদের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে টিকবে।'

বঙ্কা বললে—'কিন্তু কাছা দেবে কি ক'রে?'

'কেন দেবে না। তিন নম্বর চিত্র দেখ।'

চিংড়ি বললে—'ও! রোল-টপ টেবিলের মতন।'

'ঠিক বুঝেচিস। চিংড়ি, তোর মাথা একদম ক্লিয়ার।'

চিংড়ি বললে—'কিন্তু মামা, তোমার এ গল্প অভিনয় করা চলবে না।'

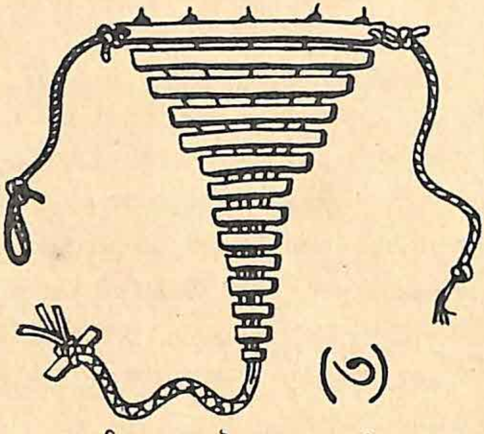
বঙ্কা বললে—'বেল-কাঠের জন্যে ভাবছিস? কিছু

দরকার নেই, জারুল-কাঠ হ'লেও চলবে, ফুট-লাইটে ঠিক বেল-কাঠ ব'লে মনে হবে।'

চিংড়ি বললে—'প'ড়ে যাও মামা।'

'জারিত বলছিল—সখা, প্রাণ যে যায়!

লারিত বললে—তাই তো দেখছি। কি একগুঁয়ে মেয়ে সব! আরে, আমাদের ভালই যদি বাসিস তবে অমন গুলিয়ে



(৩)

ফেললি কেন? কিন্তু একটা কথা না ব'লে থাকতে পারছি না। তমিতার জন্য ম'রে আছি দাদা; কিন্তু জমিতা যে আমাকে চায় তাতে আনন্দও হয়। আহা, যদি দুটিকেই পেতুম!

হারিত ঘাড় নেড়ে বললে—ঠিক, ঠিক। পঞ্চশরের কি বিচিত্র লীলা!

লারিত বললে—আচ্ছা হারিত-দা, ওদের জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে রাক্ষসবিবাহ করলে কেমন হয়?

হারিত বললে—দূর বোকা, আমরা যে ঋষির সন্তান। হয় ব্রাহ্মবিবাহ না হয় গান্ধর্ববিবাহ, এ ছাড়া অন্য বিধি নেই। চল্, আর একবার ওদের বুঝিয়ে দেখি।

ওদিকে নদীর ধারে পায়চারি করতে করতে জমিতা বলছিল—সখী, যৌবন যে যায়!

তমিতা উত্তর দিলে—যায় যাক গে, তা ব'লে তো দ্বিচারিণী হ'তে পারি না। হৃদয় যাকে চায় না তাকে মাল্যদান ক'রব কি ক'রে? কিন্তু লারিত বেচারার জন্য সত্যি আমার দুঃখ হয়, কেনই বা আমাকে চায় সে!

জমিতা বললে—অতই যদি দরদ তবে গলায় মালা দিলেই পারিস। আমারও এক জ্বালা হয়েছে—কেনই বা মরতে সেদিন বেনারসী বল্কলটা পরেছিলুম, জারিত বেচারার তো দেখে দেখে আশ মেটে না। কিন্তু লারিত-দার কোনও পছন্দ নেই, কেমন যেন একরকম।

তমিতা বললে—আহা চটো কেন জমিতা-দি, লারিতকে তো আর কেড়ে নিচ্ছি না। তাকে আজীবন ভাই বলতে পারি, দাদা বলতে পারি, ঠাকুরপো বলতে পারি, কিন্তু প্রাণনাথ বলতে শুধু হারিত-দা।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সমিতা বললে—কিন্তু সে যে আমাকেই চায়। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে!

এমন সময় তিন বন্ধু এসে উপস্থিত। হারিত সম্ভাষণ করলে—কিগো বরবর্ণিনীরা, কি হচ্ছে?

তমিতা একটু জিহ্বাবিলাস ক'রে বললে—এই যে আসুন, নমস্কার।

হারিত বললে—আর কত কাল আমাদের কষ্ট দেবে, দয়া কি হয় না? সমিতে, একবারটি হাঁ বল!

জারিত জড়িত স্বরে বললে—জমিতে, সাড়া দাও!

লারিত হাঁকলে—তমিতে, আমি যে তোমার তরে ম'রে আছি প্রিয়ে!

তমিতা স'রে গিয়ে বললে—ও হারিত-দা, দেখ না কি বলছে!

হারিত বললে—অন্যায় কিছু বলে নি। তুমি লারিতকে ধন্য কর, জমিতা জারিতকে করুক আর সমিতা আমাকে।

সমিতা বললে—সে হতেই পারে না। আমরা হৃদয় বিলি ক'রে ফেলেছি, তার আর নড়চড় নেই।

হারিত বললে—একটা রফা করা যায় না? ভগবান্ কন্দর্পকে না-হয় মধ্যস্থ মানা যাক।

জমিতা আর তমিতা প্রথমটা এ প্রস্তাবে রাজী হ'ল না। কিন্তু সমিতা তাদের বুঝিয়ে দিলে—দেখাই যাক না কন্দর্প কি করেন, আমরা তো আর নিজেদের মত বদলাচ্ছি না।

কন্দর্প নিকটেই ছিলেন, পাঁচ মিনিট আবাহন করতেই দেখা দিলেন। সব শুনে বললেন—দেখ, এ বিসংবাদ

তোমরা নিজেরাই মিটিয়ে ফেল। আমার কী বা ক্ষমতা, শুধু প্রজাপতির আদেশে পঞ্চবাণ মোচন করি। তার আঘাত যদি তোমাদের পছন্দসই না হয় তো আমি নাচার।

লারিত বললে—আপনি প্রেমচক্রে একটা উল্‌টো পাক লাগিয়ে দিন না!

হারিত বললে—দূর গর্দভ, তাতে শুধু উল্‌টো বিপত্তি হবে, প্রেমচক্র দক্ষিণাবর্তে না ঘুরে বামাবর্তে ঘুরবে, আমি চাইব তমিতাকে, তমিতা চাইবে লারিতকে—এই রকম বিপরীত অবস্থা দাঁড়াবে, তাতে কোনও পক্ষের মনস্কামনা পূর্ণ হবে না।

সমিতা কন্দর্পকে বললে—আপনি অতি বেয়াড়া লোক, ছটি নিরীহ তরুণ-তরুণীকে খামকা চরকি ঘোরাচ্ছেন। কি সুখ পাচ্ছেন এতে?

জমিতা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—আমরা অভিশাপ দেব কিন্তু, তখন মজা টের পাবেন।

তমিতা কিল তুলে বললে—লাগাও না দু-চার ঘা লারিত-দা।

বিগতিক দেখে কন্দর্প চট্ ক'রে স'রে পড়লেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। হারিত বললে—আজ আমরা বিদায় নি, রাত্রে আবার বৃহদারণ্যক আগাগোড়া মুখস্থ করতে হবে। কাল বিকেলে এসে ফের আমাদের আবেদন জানাব।

ঋষিকুমাররা চ'লে গেলে সমিতা অনেকক্ষণ ভেবে

বললে—দেখ, কন্দর্প বেঁচে থাকতে এই প্রেমচক্রের ঘুরপাক থামবে না। চল, আমরা মহাদেবকে গিয়ে ধরি, তিনি আর এবার মদনভস্ম করুন।

জমিতা মেয়েটি খুব হিসেবী। বললে—উঁহু। পঞ্চশরের ভস্ম যদি ভুবন-মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তবেই চিত্তির, যেখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতন প্রেম গজিয়ে উঠবে। একবার সাবাড় না করলে নিস্তার নেই।

তমিতার উপস্থিতবুদ্ধি সব চেয়ে বেশী। সে বললে—ভগবান্ রাহুকে ধর, তিনি কপ্ ক'রে গিলে ফেলুন।

সমিতা আর জমিতা লাফিয়ে উঠে বললে—সেই খাসা হবে। চল এক্ষুনি রাহুর কাছে যাই।'

বংকা বললে—'ছাই গল্প হচ্ছে। শাস্ত্রের কথা না-হয় মেনে নিলুম যে রাহু একটা গ্রহ, আকাশে থাকে। কিন্তু মেয়েরা তার কাছে যাবে কি ক'রে? যত সব গাঁজাখুরি।'

চিংড়ি ধমক দিয়ে বললে—'তুমি থাম ছোড়দা। এটা যে সত্যযুগ সে খেয়াল আছে? প'ড়ে যাও মামা।'

'রাহু তখন আকাশে নিরিবিলিতে ব'সে পাঁজি দেখছিলেন। মেয়েদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই? চট্ ক'রে ব'লে ফেল, আমার সময় বড্ড কম।

সমিতা হাতজোড় ক'রে বললে—প্রভু, আমরা প্রেমে পড়েছি।

রাহু ফিক ক'রে হেসে বললেন—মাইরি? তা আমাকে কেন। আমি শূন্যপথে ধাই, চাঁদ-সূর্যি খাই, প্রেমের আমি কিবা জানি। দেখছ তো, আমার শুধুই মুণ্ডু, তাতে প্রেম হয় না। প্রেম চাও তো ইন্দ্রাদি দেবতার কাছে যাও, তাঁদের ওই ব্যবসা।

সমিতা নিবেদন করলে—প্রভু, আপনাকে হৃদয় দেব এমন ভাগ্য আমরা করি নি। আমরা মানুষকেই ভালবেসেছি, কিন্তু কন্দর্প সমস্ত ওলটপালট ক'রে দিচ্ছেন। তিনি ধ্বংস না হ'লে আমাদের স্বস্তি নেই। আপনি কৃপা ক'রে তাঁকে গ্রাস করুন।

রাহু মাথা নেড়ে বললেন—সইবে না, সইবে না। চাঁদ পর্যন্ত আমার হজম হয় না, গিলতে না গিলতে বেরিয়ে যায়। কন্দর্প খেলে পেট ফাঁপবে।

তমিতা বললে—পেট তো আপনার দেখছি না।

রাহু ধমকে বললেন—হাঁ, তুই সব জানিস! আধ্যাত্মিক উদর শুনেছিস? আমার তাই।

জমিতা বললে— প্রভু, তবে আমাদের তিনটিকে ভক্ষণ করুন, বেঁচে আর সুখ নেই।

রাহু একটু বিষণ্ন হাসি হেসে বললেন—হজমের কি আর শক্তি আছে রে! শুধু লঘুপথ্য খেয়ে বেঁচে আছি, হ'ল একটু

চাঁদের কুচি, হ'ল বা গরম গরম এক কামড় সূর্য্যি। আচ্ছা, কাছে আয়, দেখি একটু তোদের গাল চেটে।

তমিতা বললে—কি যে বলেন!

তবে এলি কি করতে? যা, এখন পালা, আমার খাবার লগ্ন হ'ল।

রাহু তাঁর লকলকে গোঁপ দিয়ে খপ্ ক'রে পূর্ণচন্দ্র ধরলেন, তার পর তাতে একটু মাখন মাখিয়ে কামড় দিলেন। চার নম্বর চিত্র দেখ। মেয়েরা সে করুণ দৃশ্য সইতে পারলে না, ছুটে পালাল।

মহামুনি ঔড়ব হচ্ছেন নৈমিষারণ্যের বড় আশ্রমের কুলপতি। তাঁর দশ-হাজার শিষ্য, বিশ-হাজার ধেনু। যজ্ঞশালায় রোজ আড়াই-শ মন নীবার ধানের চাল রান্না হয়, আর তিন-শ ঝুড়ি উড়ুম্বরের তরকারি। ঔড়ব অত্যন্ত রাশভারী ঋষি, আশ্রমবাসীরা তাঁর ভয়ে তটস্থ।

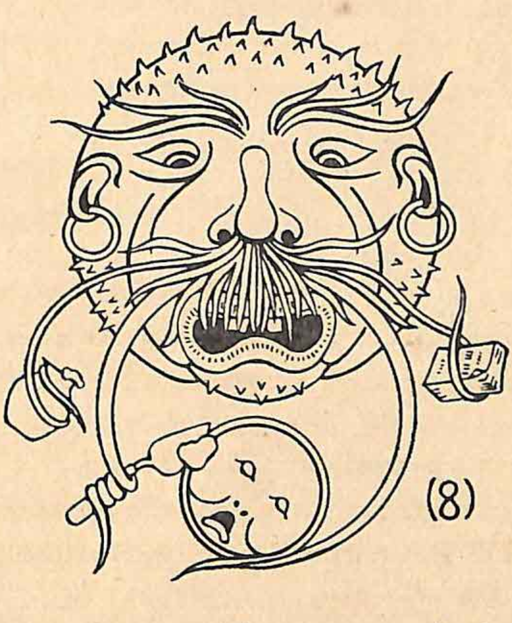
সকালবেলা হারিত জারিত আর লারিত বেদাধ্যয়ন করতে এসেছে। ঔড়ব জলদগম্ভীর স্বরে ডাকলেন—হারিত।

আজ্ঞে।

এসব কি শুনছি? তোমরা নাকি আশ্রমকন্যাদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াও? জান, এটা হচ্ছে তপোবন, ইয়ারকির

জায়গা নয়? এখন তোমাদের ব্রহ্মচর্যের সময়, সে খেয়াল আছে?

সত্যযুগে মিথ্যে কথা লোকে বড় একটা কইত না। হারিত হাতজোড় ক'রে স্বীকার করলে—প্রভু, আমরা অপরাধ করেছি।



(৪)

তবে প্রায়শ্চিত্ত কর। তিন জনে গোমুখী তীর্থে চলে যাও, নিরন্তর গোসেবা, সদ্যোজাত গোময় আহার, কবোষ্ণ

গোমূত্র পান, এই ব্যবস্থা। তাতে চিত্তশুদ্ধি পিত্তশুদ্ধি পাপমোচন একযোগে হবে। একটি বৎসর নৈমিষারণ্যের ত্রিসীমানায় এসো না।

হারিত জারিত আর লারিত গুরুদেবের চরণবন্দনা ক'রে বিষণ্ণ মনে বিদায় হ'ল।

একদিন প্রাতঃকালে কন্দর্প হিমালয়ের পাদদেশে কিন্নরমিথুন শিকার করতে গেছেন। ইতস্তত বিচরণ করতে করতে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একটা মস্ত উই-ঢিবি উঁচু হয়ে রয়েছে, তার উপর পোকা বিজবিজ করছে। কেমন সন্দেহ হ'ল। গোটা দুই বাণের খোঁচা দিতেই পনর ইঞ্চি উই-মাটির স্তর খ'সে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠরব শোনা গেল—অহো, কুসুমশর কি দুঃসহ!

কন্দর্প বললেন—ভুশুণ্ডিল মুনির গলা শুনছি না?

বল্মীকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ভুশুণ্ডিল বললেন—আমার তপস্যা ভঙ্গ করলে কেন হে? ভস্ম ক'রে ফেলব।

কন্দর্প বললেন—আরে দাঁড়াও ঠাকুর, এখন গোসা রাখ। বেজায় কাহিল হয়ে গেছ যে! নাও, এই দিব্য মকরন্দটুকু খেয়ে ফেল। গায়ে বল পাচ্ছ? বেশ বেশ, আর একটু খাও। তার পর, কিসের জন্য তপস্যা হচ্ছিল?

ভুশুণ্ডিল উত্তর দিলেন—তপস্যা আবার কিসের জন্য করে? মোক্ষলাভের জন্য।

মোক্ষ এখন থাকুক। দিব্যকান্তি চাও? তপ্তকাঞ্চনবর্ণ চাও? রমণীর মন হরণ করতে চাও?

ভুশুণ্ডিল একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন—কিন্তু তপস্যার কি হবে?

তপস্যা এখন থাক না। দিন-কতক ছুটি নাও, ফুর্তি কর।

ভুশুণ্ডিল ভেবে দেখলেন, এ রকম তো অনেক মহামুনিই ক'রে থাকেন, পরাশর বিশ্বামিত্র ব্যাসদেব। তাতে আর দোষ কি। বললেন—আচ্ছা, রাজী আছি, কিন্তু এক বৎসরের বেশী নয়।

কন্দর্প বললেন—মোটে? বেশ, তাই হবে। আমি বর দিচ্ছি, ভুবনমোহন রূপ ধারণ কর। বৎসরান্তে আবার স্বমূর্তি ফিরে পাবে, তখন যত খুশি তপস্যা ক'রো, কেউ বাধা দেবে না।

ভুশুণ্ডিলের আপাদমস্তকে একটা তারুণ্যের প্লাবন ব'য়ে গেল। কাঁচা-পাকা জটাজূট উড়ে গিয়ে মাথায় ভ্রমরবিনিন্দিত কৃষ্ণ কেশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গজিয়ে উঠল। একটা অদৃশ্য ক্ষুর চরর্ ক'রে মুখমণ্ডল নির্লোম ক'রে দিলে, রইল শুধু দু-পাশে দুটি কচি কচি জুলপি। ছাতা-পড়া নড়া দাঁত খটাখট উপড়ে গিয়ে দু-পাটি দন্তরুচিকৌমুদী ফুটে উঠল।

কটিতটে শুভ্র পট্টবাস জড়িয়ে গেল, কাঁধে চড়ল আপীত উত্তরীয়, গলায় মল্লিকার মালা, হাতে মোহন মুরলী, সর্বাঙ্গে দিব্যকান্তির পলেস্তারা। ভুণ্ডিল একটি লম্ফ দিয়ে হুংকার ছেড়ে বললেন—ভো বিশ্বচরাচর, শৃণ্বন্তু, আমি আছি, তোমরাও আছ, এইবার দেখে নেব।

কন্দর্প বললেন—অতি পাকা কথা। আচ্ছা, এইবার ওই সুদূর নৈমিষারণ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর।

ভুণ্ডিল তাই করলেন। আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন—আহা, কি দেখলুম!

কি দেখলে?

তিনটি পরমাসুন্দরী তরুণী গোমতীসলিলে স্নান করছে।

প্রাণে পুলক জাগছে?

জাগছে।

হিয়ায় হিল্লোল উঠছে?

উঠছে।

চিত্ত চুলবুল করছে?

করছে।'

চিংড়ি বললে—'মামা, এইখানটা ভারী গ্র্যান্ড লিখেছ কিন্তু।'

'হুঁহুঁ, এখনই হয়েছে কি। পরে দেখবি আরও মধুর, আরও মর্মস্পর্শী। তার পর শোন্।—

কন্দর্প বললেন—ভুণ্ডিল।

আজ্ঞে।

কোন্‌টিকে পছন্দ হয়?

ঠিক করতে পারছি না যে।

আচ্ছা, ওই যেটি তন্বী, দীর্ঘকায়া, পদ্মকোরকবর্ণা, রাজহংসীর মতন যার গলা?

অতি সুন্দর।

আর যেটি সুমধ্যমা, চম্পকগৌরী, মদমুকুলিতাক্ষী দোহারা গড়ন, টুকটুকে ঠোঁট?

চমৎকার।

আর ওই বেঁটেটি, শ্যামাঙ্গী, চঞ্চলা, চকিতমৃগনয়না, বেশ মোটা-সোটা, টেবো টেবো গাল?

ওটিও খাসা।

ব'লে ফেল কোন্‌টিকে চাও।

আজ্ঞে তিনটিকেই।

কন্দর্প ভুণ্ডিলের পিঠ চাপড়ে বললেন—সাধু ভুণ্ডিল সাধু! তবে আর দেরি ক'রো না, সোজা নৈমিষারণ্যে চ'লে যাও, গোমতীর তীরে ব'সে তোমার ওই বাঁশিটি বাজাও গে।

সমিতা জমিতা আর তমিতা বিকেলবেলা গোমতীর ধারে ব'সে নৈমিষারণ্যের বিখ্যাত চিঁড়েভাজা খাচ্ছে। হঠাৎ একটা করুণ বেসুরো বাঁশির আওয়াজ কানে এল।

সমিতা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলে, একটি লোক কশ্যপ-ঘাটে ব'সে তাদের দিকে চেয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে।

সমিতা বললে—কে ওই তরুণ? আগে তো দেখি নি কখনও।

জমিতা বললে—কেন বাঁশি বাজাচ্ছে কে জানে। কেমন যেন উদাস সুর।

তমিতা বললে—সুন্দর চেহারাটি কিন্তু।

সমিতা বললে—তোর হারিত-দার চেয়েও সুন্দর?

তমিতা ভ্রূভঙ্গী ক'রে বললে—কি যে বল! হারিত-দা জারিত-দা লারিত-দার চাইতে বুঝি কারও সুন্দর হ'তে নেই!

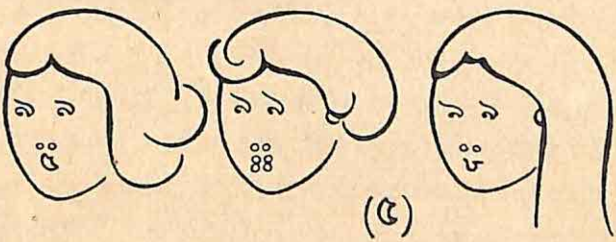
মেয়েরা অন্যমনস্ক হয়ে আড়চোখে দেখতে লাগল।— আচ্ছা চিংড়ি, আড়চোখে চাওয়া কি রকম ক'রে আঁকতে হয় জানিস?'

চিংড়ি বললে—'খুব সোজা। একটা আণ্ডার মতন আঁক। মাথায় ইচ্ছে-মত চুল বসাও। কপালে নিরেনব্বই লেখ, তার নীচে একটা কাত-করা বিসর্গ, তার নীচে একটা পাঁচ। যদি দাঁত দেখাতে চাও তবে চুয়াল্লিশ বসাও। আর যদি মোনা-লিসার ধরনের নিগূঢ় হাসি ফোটাতে চাও তবে আট লেখ।'

'বাঃ, ঠিক হয়েছে। পাঁচ নম্বর চিত্র দেখ। তার পর শোন্।—

একটি বৎসর দেখতে দেখতে কেটে গেল। হারিত জারিত আর লারিত প্রায়শ্চিত্ত শেষ ক'রে তীব্র আশা আর দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে নৈমিষারণ্যে ফিরে এল। মেয়েদের সংবাদ কি? তারা কি এখনও নিজেদের গোঁ বজায় রেখেছে? এই বৎসরব্যাপী বিচ্ছেদের ফলে তারা কি প্রেমের সোজা পথটি খুঁজে পায় নি, মনে একটুও প্রতিদানস্পৃহা জাগে নি? হবেও বা।

কিন্তু খবর যা শুনলে তা মর্মান্তিক। সমিতা জমিতা তমিতা তিন জনেই ভুণ্ডিলকে মাল্যদান করেছে। হা রে কন্দর্প, এই কি তোর মনে ছিল? প্রেমচক্রে বৃথাই এতদিন ঘুরপাক খাওয়ালি? হায় হায়, কেন তারা মেয়েদের মতেই সায় দেয় নি, সে তো মন্দের ভাল ছিল! আর মেয়ে তিনটেরও ধন্য রুচি, শেষে কিনা ভুণ্ডিল!



(৫)

হারিত মাথা চাপড়ে বললে—ওঃ স্ত্রীচরিত্র কি কুটিল! ওদের কিস্সু বিশ্বাস নেই।

জারিত হাত নেড়ে বললে—একেবারে যাস্‌সেতাই।

লারিত দাড়ি ছিঁড়ে বললে—তিনটি বস্‌সর নাহক ভুগিয়েছে মশাই।

তিন উদ্দাম প্রেমিক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ভুণ্ডিলের বাড়ি। ব্যাটাকে ঠেঙিয়ে মনের জ্বালা দূর করতে হবে, তাতে মহামুনি ঔড়ব ভস্মই করুন আর তির্যগ্‌যোনিতেই পাঠান।

ভুণ্ডিলের কুটীরে কেউ নেই, শুধু প্রাঙ্গণে একটি আশ্রমব্যাঘ্রী তৃণভোজন করছে আর তিনটি হরিণশিশু তার স্তন্য পান করেছে। এই স্নিগ্ধ শান্ত আশ্রমসুলভ দৃশ্য দেখে ঋষিকুমারদের হুঁশ হ'ল, অহিংসার কাছে কিছু নেই। হারিত ব্যাঘ্রীটিকে একটু আদর ক'রে সঙ্গীদের বললে—যা হবার তা তো হয়ে গেছে, দৈবই সর্বত্র বলবান্‌। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ। মিথ্যা ঋষিহত্যা ক'রে কি হবে, চল আমরা গোমুখী তীর্থে ফিরে গিয়ে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।

সংসারে বীতরাগ হয়ে তারা আবার উত্তর মুখে চলল। কিন্তু দৈবের মতলব অন্য রকম। একটু যেতে না যেতে তারা দেখতে পেলে, বটগাছের তলায় একটি বল্মীকস্তূপ, সমিতা জমিতা আর তমিতা তার উপরে ঝাঁটা চালাচ্ছে।

একটি সলজ্জ ম্লান হাসি হেসে তমিতা বললে—এই যে, আসুন, নমস্কার। ভাল আছেন তো? কবে এলেন?

হারিত বললে—ভদ্রে, এ কি?

অবনতমস্তকে সমিতা উত্তর দিলে—এই উইঢিপির মধ্যে আছেন। কাল বিকেল পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন, কত গল্প কত হাসি কত গান। যেমন সূর্যাস্ত হ'ল, অমনি হঠাৎ কেমন একটা কাঁপুনি ধ'রল, আর চেহারাটাও এক মুহূর্তে বিকট কাল মোটা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এক রাশ জটা আর মুখ-ভরা বিশ্রী দাড়ি-গোঁপ। আমরা তো ভয়ে পালিয়ে গেলুম। তার পর খুঁজে খুঁজে পেলুম এই বটতলায় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তপস্যা করছেন। অনেক ডাকাডাকি করতে একবার চোখ মেলে চাইলেন, ধমকে বললেন—খবরদার, ভস্ম ক'রে ফেলব। দেখতে দেখতে সর্বাঙ্গে উই লেগে মাটির প্রলেপ জ'মে গেল, দেখুন না, একদিনেই আগাপাস্তলা চাপা প'ড়ে গেছে। আমরা কি আর করি, তিন জনে ঝাঁটা বুলিয়ে উই তাড়াচ্ছি।

হারিত বললে—না না না অমন কাজও ক'রো না, তাতে ওঁর তপস্যার হানি হবে। উই অত্যন্ত উপকারী প্রাণী, তপশ্চর্যার একটি প্রধান অঙ্গ, বাহ্য বিষয় রোধ ক'রে মনকে অন্তর্মুখ করতে অমন আর দুটি নেই।

জারিত বললে—তা ছাড়া, উই-মাটি ভেঙে গিয়ে যদি ভিতরে হাওয়া ঢোকে, তবে চ'টে গিয়ে বিলকুল ভস্ম ক'রে ফেলবেন।

লারিত বললে—ওঃ, কি জোচ্চোর হৃদয়হীন তপস্বী, তিন-তিনটি তরুণীকে ভাসিয়ে দিলে!

তমিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে—ওগো সেই বাঁশিতেই সর্বনাশ করেছে।

জমিতা গদ্‌গদ কণ্ঠে ডাকলে—ও হারিন্দা জারিন্দা লারিন্দা!

হারিত বললে—ভয় কি, আমরা তিন জনেই আছি। ওঁকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, কল্পান্ত পর্যন্ত সমাধিস্থ হয়েই থাকুন। তোমরা আমাদের সঙ্গে হিমালয়ে চল, সেখানেই আশ্রম নির্মাণ করা যাবে।

কিন্তু আমরা যে সতী, হারিত-দা!

আমরাই কোন্ অসৎ। চল চল, বেলা ব'য়ে যায়।'

বঙ্কা বললে—'থামলে কেন মামা, তার পর?'

'তার পর আর নেই। তোর মামী আর লিখতে দেয় নি।'

'আঃ, মামীর যদি কিছু আক্কেল থাকে!'

চিংড়ি বললে—'এ মামীর ভারী অন্যায় কিন্তু। সত্যযুগে কী না হ'তে পারে। আচ্ছা, তোমার তো মনে আছে, শেষটা মুখে মুখেই বল না, আমি লিখে নিচ্ছি।'

'উঁহু, একদম গুলিয়ে গেছে, যে তোর মামীর ধমক।'

বঙ্কা বললে—'তোমার মরাল কারেজ কিচ্ছু নেই। দাও আমাকে, আমিই শেষ ক'রব।'

১৩৩৯